প্রত্যয়

অন্নদাশঙ্কর রায়

ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

সূচী

গান্ধীজীর সংগ্রাম	....	...	৩
মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা	....	....	৬
৩০শে জানুয়ারী	...	...	৯
বিশ্বাস ফিরিয়ে আনা	....	...	১১
বাস্তববাদী	....	....	১৬
আমরা তা হলে কী করব	....	...	২৪
আমি কী বিশ্বাস করি ও করিনে		...	৩৩
সংশয়বাদী	...	...	৩৯
দেশপ্রেম বনাম জাতিপ্রেম	...	...	৪৬
চিড়িয়াখানা	....	...	৫০
পনেরোই অগাস্ট	....	....	৬১
গান্ধীজন্ম	....	...	৭৩
জমি কার	....	...	৮৩
হাতীর খোরাক	...	...	৯০

"বিশ্বাস ফিরিয়ে আনা"র রচনাকাল ১৯৫০।

অন্নদাশঙ্কর রায়

অন্যান্য প্রবন্ধের বই

তারুণ্য
আমরা
জীবনশিল্পী
ইশারা
বিনুর বই
জীয়নকাটি
দেশকালপাত্র

ভ্রমণের বই

পথে প্রবাসে
ইউরোপের চিঠি

কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব

শ্রদ্ধাস্পদেষু

সমস্ত প্রতিকূল প্রমাণ সত্ত্বেও আমি বিশ্বাস করি যে জনগণ এক ও অভিন্ন।

সমস্ত প্রতিকূল প্রমাণ সত্ত্বেও আমি বিশ্বাস করি যে জনগণ অহিংস।

অন্নদাশঙ্কর রায়

৩০শে বৈশাখ ১৩৫৮

প্রত্যয়

গান্ধীজীর সংগ্রাম

গান্ধীপরিচালিত সংগ্রাম ছিল একই সঙ্গে দুই মহাশক্তির বিরুদ্ধে। একটার নাম তো বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ, অপরটার নাম সব দেশের ও সব কালের সমরবাদ। প্রথমটাকে তিনি ভারতছাড়া করেছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয়টাকে নিয়ে ভাবনায় পড়েছিলেন। তাঁর সহযোদ্ধারা শাসনযন্ত্রের ভার পেয়ে দেখলেন সমরযন্ত্রের সাহায্য বিনা শান্তিরক্ষা সম্ভব নয়। দেশরক্ষা তো নয়ই। এ কথা যদি সত্য হয় তবে সমরবাদ এ দেশে চিরস্থায়ী হতে বাধ্য। কিন্তু গান্ধীজী এ কথা সত্য বলে মেনে নিতে রাজি ছিলেন না। যার বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম সেই যদি চিরস্থায়ী হয় তবে সংগ্রাম বৃথা।

সহযোদ্ধারা যখন দিল্লীর সিংহাসনে তিনি তখন নোয়াখালীর গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন সমরযন্ত্রের সাহায্য না নিয়ে শান্তিপ্রতিষ্ঠা করা সম্ভব বলে প্রমাণ করতে। নোয়াখালী থেকে বিহার, বিহার থেকে কলকাতা, কলকাতা থেকে দিল্লী, যেখানেই যান সেখানেই তাঁর একমাত্র ধ্যান কী করে তিমি প্রমাণ করবেন যে শান্তিস্থাপনের জন্যে সমরযন্ত্রের সাহায্য নেবার দরকার নেই। তাঁর উপরেই প্রমাণের সবটা দায়, তাঁর

সহযোদ্ধাদের উপরে একটুও না! যতদিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলছিল ততদিন তাঁরা তাঁর সঙ্গে ছিলেন বলে তাঁরাও যে তার মতো সমরবাদের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করছিলেন তা তো নয়। তাঁরা তাঁকে ছেড়েছিলেন। কেবল তিনিই তাঁদের ছাড়তে পারছিলেন না ভালোবাসার খাতিরে।

প্রমাণ করতে তিনি একেবারেই পারলেন না, কেমন করে বলি? কলকাতার শান্তি, দিল্লীর শান্তি বহু পরিমাণে তাঁরই চেষ্টার ফল। বেঁচে থাকলে শান্তিরক্ষার কাজ আরো অগ্রসর হ'ত। তবে কাশ্মীর ও হায়দরাবাদ এই দুই কুরুক্ষেত্রে অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হয়ে আসছিল। জনশক্তি পিছনে ছিল না। যতদিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলছিল ততদিন পিছনে ছিল, তারপরে তাঁকে ছেড়েছিল। নয়তো অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হয়ে আসত না। শেষের দিকে তিনি ছিলেন একান্ত নিঃসঙ্গ, তাঁর সংগ্রাম যেন তাঁর একার সংগ্রাম। যেন জনগণের নয়।

এখন তো তিনি নেই, প্রমাণ করবার দায় তাঁর অবর্তমানে তাঁর শিষ্যদের। প্রমাণ করা মুখের কথা নয়, করতে হবে জীবন আহুতি দিয়ে। জনগণ যাতে পিছনে দাঁড়ায় তার আয়োজন করতে হবে। নইলে শান্তির কাজ আশানুরূপ অগ্রসর হবে না। নিঃসঙ্গ মানুষের চেষ্টা পদে পদে ব্যাহত হবে। জনগণ সজাগ না থাকলে তিনি হয়তো নিহত হবেন।

শান্তিবাদ হচ্ছে শান্তির জন্যে সংগ্রাম। অন্যান্য সংগ্রামের মতো এখানেও সেনাপতি হবেন একজন, কিন্তু সেনা হবে অগণ্য। জীবন

দান করতে প্রস্তুত হতে হবে প্রত্যেককে এবং তেমন সুযোগ জুটবে অনেকেরই ভাগ্যে। এই পরীক্ষা আরম্ভ করে গেছেন গান্ধীজী, সমাপ্ত করে যেতে পারেননি। সমাপনের ভার তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যদের উপরে। তাঁরা যদি তাঁদের কর্তব্য না করেন আর কেউ করবেন আর কোনো দেশে। হয়তো এই যুগেই, নয়তো আর কোনো যুগে। তাঁর আরব্ধ কর্ম অসমাপ্ত থাকবে না চিরকাল। সমরবাদ চিরস্থায়ী হবে এ কখনো সত্য নয়। সাম্রাজ্যবাদের মতো সেও একদিন যাবে।

(১৯৪৮-৪৯)।

মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা

ক্যাপিটালিজম ও কমিউনিজম এই দুই চরম পন্থার মাঝখানে হয়তো একটা নরম পন্থা আছে, কিন্তু সেই মধ্যপন্থার নাম গান্ধীপন্থা নয়। গান্ধীপন্থাও এক প্রকার চরম পন্থা। মধ্যপন্থাকে যাঁরা উত্তম পন্থা বলে বরণ করেছেন তাঁরা যেন তাকে গান্ধীপন্থা বলে ভুল না করেন। অথবা অপর দশজনকে ভুল না বোঝান।

গান্ধীপন্থাও এক প্রকার চরম পন্থা। ক্যাপিটালিজমের সঙ্গে এর সেই সম্পর্ক যে সম্পর্ক সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে। অর্থাৎ আপোশহীন বিরোধ। এই ভাবটাই ব্যক্তিত হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ধ্বজার উপর চরকার বজ্রাঙ্কুশ এঁকে। যারা বিরোধে বিশ্বাস করেন না, আপোশে বিশ্বাস করেন, তাঁরা তাদের পতাকা থেকে চরকাকে সরিয়েছেন। চরকাকে সরানো মানে গান্ধীবাদকে সরানো। গান্ধীবাদকে সরানো মানে গান্ধীজীকে সরানো। গান্ধীজীকে সরানোর অবশ্যম্ভাবী পরিণাম গান্ধী হত্যা। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হবে যদি তারা মধ্যপন্থার নাম রাখেন গান্ধীপন্থা।

যেদিন ভারতের গ্রামে গ্রামে যথেষ্ট পরিমাণে খদ্দর তৈরি হবে

প্রত্যয়

সেদিন শহরের কাপড় তৈরি করার জন্যে হয়তো কয়েকটা কাপড়ের কল থাকবে, কিন্তু গ্রামের কাপড়ের জন্যে একটিও কল থাকবে না। আপোশ বলতে এই পর্য্যন্ত। এর বেশি না। মধ্যপন্থীরা কিন্তু প্রত্যেকটি কল চালু রাখতে চাইবেন, সুযোগ পেলে আরো কয়েকটা বাড়াবেন, তবে তাঁতীর উপর দয়া করে কিছু জায়গা ছেড়ে দেবেন। সুতো জোগাবে কিন্তু চরকা নয়, কল। গ্রাম নয় শহর।

শহরের কাপড়ের কলগুলোতে যে কোটি কোটি টাকার মূলধন খাটছে সেই কোটি কোটি টাকার মূলধন বিপন্ন হবে যদি সাত লক্ষ গ্রামে সাত কোটি চরকা চলে। সুতরাং চরকার সঙ্গে মিলের অহিনকুল সম্পর্ক। চরকাকে নিশ্চিহ্ন করতে পারলেই মিলওয়ালাদের মূলধন নিষ্কণ্টক হয়। মিলওয়ালাদের কাছে যাঁরা শেয়ার কিনেছেন তাঁদেরও ডিভিডেণ্ড নিরাপদ হয়। অতএব চরকাকে তাঁরা জায়গা ছেড়ে দিতে পারেন না। এত দিন যে সহ্য করেছেন সে শুধু গান্ধীজীর হাতে ক্ষমতা ছিল না বলে। ক্ষমতা যেদিন এলো সেদিন চরকাকে সরিয়ে সমঝিয়ে দেওয়া হলো যে ক্ষমতা তাঁর হাতে নেই। তিনি যেমন অক্ষম ছিলেন তেমনি অক্ষম রয়ে গেলেন। না, তার চেয়েও অক্ষম, কেননা দেশ স্বাধীন হবার পরে তো আর অসহযোগ করা চলে না।

চরকা সম্বন্ধে যা বলা গেল ঘানি ঢেঁকি প্রভৃতি গ্রাম্য যন্ত্রপাতি সম্বন্ধেও তাই বলা যায়। এসব যদি গ্রামে গ্রামে চলে তবে শহরের ধানকল তেলকল ইত্যাদিতে যে মূলধনটা খাটছে সেটা বিকল হয়। যাঁরা শেয়ার কিনেছেন তাঁদের ডিভিডেণ্ড মারা যায়। গ্রামগুলো যদি

প্রত্যয়

প্রত্যেক বিষয়ে স্বাবলম্বী হয় তা হলে কোটি কোটি টাকার মুলধন বেকার হয়। যাঁরা মূলধনের জন্যে আমেরিকার কাছে দরবার করছেন তাঁরা তো ইচ্ছা কয়লে এই স্বদেশী মূলধনটাকে টেনে নিতে পারতেন। তা হলে গ্রামও বাঁচত, শহরও বাঁচত। এই মর্মে আপোশ করলে গান্ধীপন্থার সঙ্গে বেখাপ হতো না।

(১৯৪৯)

৩০শে জানুয়ারী

বিনু ভাবছিল মনে মনে। এসব কথা কাউকে বলবার নয়, বলে লাভও নেই।

বাপ মারা গেলে ছেলেরা কাঁদে, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু বাপ যদি খুন হয় তা হলে কি তারা কাঁদে, না জ্বলে পুড়ে মরে? গান্ধীজী যদি দেশশুদ্ধ লোকের বাপু হয়ে থাকতেন তা হলে গান্ধীহত্যার পরে আমরা অন্য দৃশ্য দেখতুম! দেখতুম দেশের লোকের চোখে জল নেই, চোখ দিয়ে আগুন বেরোচ্ছে। সে আগুন অহিংস হতে পারে, তবু তা আগুন। তা ল নয়।

কিন্তু দেখা গেল তাদের চোখে আগুন নেই। অধিকাংশের চোখে জল। অনেকের চোখে কুটিল হাসি। তাদের কেউ কেউ মিষ্টান্ন বিতরণ করেছে, কেউ কেউ মিষ্টিমুখ করেছে। আওরংজেবের অবতার হিন্দুর সর্ব্বনাশ করতে জন্মেছিলেন, বেঁচে থাকলে সর্ব্বনাশ করতেন। শিবাজীর অবতার তাই তাকে বিনাশ করেছে। কে কার উপর রাগ করবে!

গান্ধীহত্যার পর দু'বছর কেটে গেছে। এই দু'বছরে অন্ততঃ এইটুকু উন্নতি হয়েছে যে গান্ধীজী যে হিন্দুর শত্রু একথা লোকে সহজে বিশ্বাস করে না। বছর দু'তিন বাদে একেবারেই বিশ্বাস করবে না। তখন আসবে রাগ করার সময়।

সে রাগ জোয়ারের মতো আসবে। হয়তো হিংসার আকার নেবে। অহিংসার রূপ নিলেও সে রাগ জোয়ারের মুখে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে সেই শক্তিকে যে শক্তি জনগণকে বিভ্রান্ত করেছে সাম্প্রদায়িকতার অন্ধ পথে।

বিপ্লবকে বেশী দিন বিভ্রান্ত করা যায় না। এক বছর, দু'বছর, তিন বছর, চার বছর, পাচ বছর। না, তার বেশী নয়। গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর দেশবাসীর বিচ্ছেদ, নেতার সঙ্গে তাঁর অনুবর্ত্তীদের বিচ্ছেদ কখনো এত কাল স্থায়ী হতে পারে না। তা যদি হয় তা হলে বুঝতে হবে দেশ ও কাল গান্ধীজীর জন্যে প্রস্তুত ছিল না, তিনি এ দেশের ও এ যুগের মানুষ ছিলেন না। আমি কিন্তু অবুঝ। আমি কিছুতেই মানব না যে গান্ধীজী এ যুগের বা এ দেশের নন। এ যুগের সঙ্গে, এ দেশের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আকস্মিক নয়। এ যোগাযোগ এত গভীর যে ভারতবর্ষ একদিন ক্রুদ্ধ হয়ে আবিষ্কার করবে তাকে গান্ধীনেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে বলেই সে অন্ধকারে পথ খুঁজে মরছে।

জনগণের সেই ক্রোধ কেউ রোধ করতে পারবে না। তবে ইচ্ছা করলে তাকে অহিংস প্রণালীতে পরিচালিত করা যায়। তা হলেই তা ধ্বংসের জন্যে উন্মাদ না হয়ে সৃষ্টির জন্যে উদ্যোগী হবে। তখন সেই সৃষ্টিও হবে বৈপ্লবিক। জ্বালা না থাকলে সৃষ্টি হয় না। সৃষ্টি করতে পারে সেই ব্যক্তি বা সেই দেশ যে জ্যোতিষ্কের মতো জ্বলছে।

(১৯৫০)

বিশ্বাস ফিরিয়ে আনা

আশাবাদী হয়তো আরো কিছুক্ষণ বসতেন, কিন্তু নিরাশাবাদীকে ঘরে ঢুকতে দেখে তাঁর হঠাৎ মনে পড়ে গেল কোথায় যেন কী কাজ আছে। তিনি যাবার সময় বললেন, "ভুলে যাবেন না, এটা হচ্ছে যাকে বলে ট্রানজিশন পিরিয়ড়। ও রকম একটু আধটু হবেই। আমার কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। এবং তার সূচনা," তিনি উদ্দীপ্ত হয়ে বললেন, "আর পাঁচ বছরের মধ্যে পরিস্ফুট হবে। এদেশের উপর ভগবানের বিশেষ করুণা আছে।"

নিরাশাবাদী এর উত্তর দেবার জন্যে মুখ খুলতে যাচ্ছিলেন, আশাবাদী তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, "আমি ইন্‌টেলেক্‌ট দিয়ে এই প্রত্যয়ে পৌঁছই নি। আমার কিছু অকাল্ট পাওয়ার আছে। আমি দিব্য চক্ষে ভবিষ্যৎ দেখতে পাই। ভারত যে স্বাধীন হবে এও আমি দেখতে পেয়েছিলুম ঘটনার ঠিক পাঁচ বছর আগে। সেই ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে।"

তাঁকে ধরে রাখা গেল না। নিরাশাবাদী তর্কের সুযোগ হারিয়ে ক্ষুণ্ণ হয়ে বললেন, "বেশ আছেন ভদ্রলোক।" তারপর বললেন, "কেন এমন হলো! একটা স্বাধীন দেশ, এই তার স্বাধীনতার চেহারা। এরই জন্যে তপস্যা করেছিলুম কৈশোরকাল থেকে। কোথাও এতটুকু

উৎসাহ নেই, প্রেরণা নেই। হিমালয়ের মতো অবিচল কঠোর—করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গের—সংকল্প নেই। আছে কেবল অকর্মক চিন্তা, অকাণ্ট পাওয়ায়! ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল!"

বিন্থ চুপচাপ বসেছিল। বহুদিন ধরে ভাবছে, কিন্তু ভেবে কোনো কুল কিনারা পাচ্ছে না। যেখানে বিশ্বাসের জোর নেই সেখানে চিন্তা একপ্রকার চিত্তবিনোদন। বলল, "পরিবর্ত্তন হবেই।"

নিরাশাবাদী বিশ্বাস করলেন না। বললেন, "পরিবর্ত্তন তো মন্দের দিকে হতে পারে।"

বিন্থ বলল, "তবে শোন। আজকে আমার পালা বলবার, তোমার পালা শোনবার। কাল পালাবদল হবে।

আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে বিশ্বাস ফিরিয়ে আনা, যে বিশ্বাস আমাদের ছিল। আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে বিধাতা এক একটা দেশ সৃষ্টি করেছেন এক একটা পরীক্ষার জন্যে। ইংলণ্ডে তাঁর যে পরীক্ষা চলেছে তার নাম ডেমক্রেসী। আগে ছিল পলিটিকাল ডেমক্রেসী। এখন সোশ্যাল ডেমক্রেসী। রাশিয়ায় তাঁর পরীক্ষা কমিউনিজম। কমিউনিজমের বীজ সে দেশের মাটিতে ছিল কিন্তু সেটা ছিল ইউটোপিয়ান। এখন হয়েছে সায়েন্টিফিক। তেমনি ভারতবর্ষেও তাঁর পরীক্ষা চলেছে যুগের পর যুগ ধরে। তাঁর এই পরীক্ষার নাম অহিংসা। আগে ছিল ব্যষ্টিগত। এখন সমষ্টিগত। আমাদের জীবনে আমরা এর যেটুকু দেখেছি হয়তো তার বেশী দেখতে পাব না। হয়তো এর পরে যা আসছে তা এর বিপরীত। কিন্তু আমাদের জীবন দিয়ে জাতির

জীবনের ইয়ত্তা হয় না। জাতির জীবনে অহিংসার পরীক্ষা বারম্বার হবে, হয়তো কোনবারই নিখুঁত হবে না, তবু হবে, হবে, হবে। মহাত্মার মতো এত বড় নেতা আর আসবেন না, কিন্তু বিধাতার কাজ মহাপুরুষের জন্য অপেক্ষা করে না, সামান্য মানুষকে দিয়েও তিনি তাঁর কাজ করিয়ে নেন।

সমষ্টিগত অহিংসার জন্যে ভারতের মুখ চেয়ে আছে পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশ। তাদের সেই প্রত্যাশা আমরা পূরণ করতে পারছিনে। মহাত্মাকেও শেষে স্বীকার করতে হলো যে আমাদের এই অহিংসা সত্যিকার অহিংসা নয়, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ। সত্যিকার অহিংসা প্রেমিকের ধর্ম, বীরের ধর্ম। আমরা তার পরীক্ষা দিইনি। আমাদের হয়ে তাঁকেই তার পরীক্ষা দিতে হলো। অগ্নিপরীক্ষা। সমষ্টির জীবনে এ শিক্ষা ব্যর্থ হবে না। আমাদের দৃষ্টি অন্তর্ভেদী নয়। হলে দেখতে পেতুম এ শিক্ষা জাতির অন্তরে প্রবেশ করেছে, অন্তরালে কাজ করছে। সময় না হলে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে না। কবে সময় হবে তা কেউ বলতে পারে না। পঞ্চাশ বছরও তার পক্ষে বেশী সময় নয়। মহাত্মা তো আরো পঞ্চাশ বছর বাঁচতেই চেয়েছিলেন তার দেরী আছে আন্দাজ করে। হয়তো অত দেরী হবে না, তাঁর দীর্ঘ জীবনের চেয়ে তাঁর হত্যাই তাঁর উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহায়ক হবে। তিনি বেঁচে থাকলে যার জন্যে পঞ্চাশ বছর লাগত তিনি নিষ্ঠুরভাবে নিহত হলেন বলেই তা দশ বছরে হবে।

আমার নিজের বিশ্বাস গান্ধীজীর পরীক্ষার সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্পর্ক আকস্মিক নয়। যেমন লেনিনের পরীক্ষার সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্ক

আকস্মিক নয়। আমরা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী দেশের ষোলো আনার নাড়ীনক্ষত্র জানিনে। যেমন রাশিয়ার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী জানত না। তাদের মতো আমাদেরও অহঙ্কার আমরাই দেশের ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণ করার মালিক। এ অহঙ্কার অজ্ঞতার উপর দাঁড়িয়েছে। একটা ভূমিকম্পেই এর পতন ঘটবে। গান্ধীজী এ দেশকে সমস্ত সত্তা দিয়ে চিনেছিলেন, তাই অত বড় একটা পরীক্ষায় নামতে সাহস পেয়েছিলেন। দেশের ষোলো আনার উপর তাঁর অটল বিশ্বাস ছিল, তাই তিনি কোনো দিন হতাশ হননি। আমরা তো একটুতেই হতাশ হই। আমাদের আশাবাদীর অকাণ্ট পাওয়ার তাঁকে হতাশার হাত থেকে বাঁচাবে না, যখন দেখবেন মধ্যবিত্ত নেতৃত্ব সঙ্কটের দিন ছত্রভঙ্গ হয়েছে। আসলে আমাদের আশাবাদও এক প্রকার নিরাশাবাদ, কারণ এর পিছনে কোনো সত্যিকার শক্তি নেই, যা আছে তা ঐ অকাণ্ট পাওয়ার। বিপদের দিন ও শক্তি আমাদের পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে ঘোড়দৌড় করিয়েছে, এর পর করাবে হিমালয়ে দোঁ দৌড়।

শক্তি আসে জনগণের সঙ্গে অভিন্ন হলে। শক্তি আসে বিধাতার ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গত হলে। এর কোনোটাতে আমাদের বিশ্বাস নেই। আমাদের বিশ্বাস পুলিশে, আমাদের বিশ্বাস ফৌজে। অবস্থা আর একটু খারাপের দিকে গেলেই আমরা মিলিটারির হাতে শহর তুলে দেব। মিলিটারি যদি অক্ষম হয় তা হলে আমাদের দশা হবে চীনা মধ্যবিত্তদের মতো। ওরা এখন সন্ধির জন্যে আকুল। এই আকুলতা পাঁচ বছর আগে ছিল না। তখন অকাণ্ট পাওয়ার ওদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের

স্বপ্নে বিভোর করেছিল। তার পিছনে ছিল মিলিটারি পাওয়ার সম্বন্ধে পরম নির্ভরতা।

গান্ধীজী জানতেন যে, সঙ্কটের দিন পুলিশ বা মিলিটারির উপর একান্ত নির্ভর করা যায় না। নির্ভর করতে হয় ভগবানের উপর তথা জনগণের উপর। ভগবানের বিশেষ করুণার উপর নয়, তাঁর ঐতিহাসিক ইচ্ছার উপর। সে ইচ্ছা রাশিয়াতে, ইংলণ্ডে, চীনে, ইন্দোনেশিয়ায়, আফ্রিকায় কাজ করছে, কেবল ভারতবর্ষে নয়। বিশেষ করুণা তাঁর কারো উপর নেই; তবে বিশেষ দেশে তাঁর বিশেষ পরীক্ষা। আমাদের এখানে বিশেষ পরীক্ষা হচ্ছে তা যদি জানি ও তার সহায়তা করি তবেই তাঁর করুণা পাব।"

বাস্তববাদী

বাস্তববাদী বললেন, "দেশ যখন পরাধীন ছিল, নিজেদের যখন সৈন্যদল ছিল না, যখন হিংসার নাম করলে পুলিশে ধরে নিয়ে যেত তখনকার দিনে অহিংসার হয়তো কোনো প্রয়োজন ছিল। এবং চরকার। যদিও অহিংসার সঙ্গে চরকার যে কী সম্পর্ক তা আমার জ্ঞানবুদ্ধির অগম্য। এখন দেশ স্বাধীন হয়েছে, নিজেদের একটা সৈন্যদল রয়েছে, কলকারখানা বিদেশীর হাত থেকে দেশের লোকের হাতে আসছে। এখন অহিংসার কী প্রয়োজন, চরকার কী দরকার, বলতে পারো?"

বিনু বলল, "আমরা জানতুম যে দেশ স্বাধীন হলে এ প্রশ্ন একদিন উঠবে। সেইজন্যে আজ দেশের মতিগতি দেখে অবাক হচ্ছিনে। হচ্ছি তাদের মতিগতি দেখে যাঁরা ত্রিশ বছর ধরে গান্ধীজীর কাছে মূলনীতির পাঠ নিয়েছিলেন। না, অহিংসার কোনো প্রয়োজন নেই, চরকার কোনো দরকার নেই, গান্ধীজীও গেছেন, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাধনাও গেছে। তোমরা যত শীগগির পারো তাঁকে ভুলে যাও, ভুলে যাও যে তাঁর সহকর্মী হিসাবে তোমাদের উপর তাঁর সাধনার দায় বর্তেছে। শুধু দয়া করে একটি কাজ করো। জনগণের সামনে দাঁড়িয়ে বলো যে গান্ধীজীকে তোমরা ছেড়েছ।"

"জনগণ," বাস্তববাদী বললেন, "এখনো গান্ধীজীর নামে ভোট দেয়। আমরা যদি বলি যে আমরা গান্ধীজীকে ছেড়েছি তা হলে তারা আমাদের ছাড়বে। কাজেই আমরা অমন কথা মুখ ফুটে বলতে পারিনে। তা বলে যা কার্যক্ষেত্রে অচল তা চালাতে গিয়ে নাকাল হই কেন? তুমি কি মনে করেছ কলকারখানা উঠিয়ে দিতে চাইলেই উঠে যাবে? কলকারখানা উঠিয়ে দিলে সৈন্যদলকে অস্ত্র জোগাবে বস্ত্র জোগাবে কী করে? আর সৈন্যদল ভেঙে দিলে পাকিস্থানকে ঠেকাবে রাশিয়াকে ঠেকাবে কী দিয়ে? আমাদের উপর এখন রাষ্ট্রের দায়িত্ব। আমরা কি ওসব এক্সপেরিমেণ্ট চালাতে পারি?"

"তা কি আর বুঝিনে?" বিনু বলল, "গান্ধীজীর পরীক্ষা তোমরা যে চালাবে না তিনি সে কথা বুঝতেন। তার জন্যে তাঁর মনে দুঃখ ছিল। কিন্তু পরীক্ষার দরকার থাকলে চালাবার লোকেরও দরকার থাকে। ভগবান তাঁদের জোটাবেন। তেমন লোক যে আজ নেই তা নয়। তাঁরা চালিয়ে যাচ্ছেন পরীক্ষা। যে কোনো একটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সঙ্গে এর তুলনা করলে দেখবে যে ত্রিশ বছরে এ পরীক্ষা অনেকদূর এগিয়েছে, আরো এগোবে সামনের দশ বছরে। তোমাদের জন্যে এ পরীক্ষা বসে থাকবে না। তোমরা যখন থাকবে না তখনো এ পরীক্ষা চলতে থাকবে। জনগণের আধ্যাত্মিক তথা আধিভৌতিক প্রয়োজন মিটছে এ দিয়ে। যদিও তারা স্পষ্ট বুঝতে পারছে না কেন এর দরকার। কার্যকালে তারাও অহিংসা মানে না, চরকা মানে না, কিন্তু তারা অস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করে যে এসব তাদেরই জন্যে। তোমাদের মতো

তাদের মনে অবিশ্বাস নেই। সেইজন্যে তারা গান্ধীজীকে ছাড়েনি। ছাড়বেও না কোনোদিন, যদি তাঁর পরীক্ষা চালিয়ে যাবার মতো দশ বিশজন অনুচর থাকেন।”

বাস্তববাদী বললেন, “গান্ধীজীকে তারা ভালোবাসে, কিন্তু গান্ধীবাদ হলো অন্য জিনিস। গান্ধীবাদের উপর তাদের বিশ্বাস ক'দিন থাকবে? ইতিমধ্যেই তাদের বিশ্বাস টলেছে। তারা চায় পাকিস্থানের সঙ্গে যুদ্ধ। তারা চায় ভারতকে নির্মুসলমান করতে। তার প্রমাণ তারা নিজের হাতে দিচ্ছে। গুলি চালিয়ে তাদের নিরস্ত করছি আমরা, নইলে তাদের নিরস্ত করা শিবের অসাধ্য। গান্ধীজী বেঁচে থাকলে এবার অনশনে মরতেন। এবার তিনি বাঁচতেন না।”

“কী জানি, আমি অতটা নিশ্চিত নই। উত্তেজনার মুখে মানুষ অনেক কিছু চায়। নিজের হাতে স্ত্রী-পুত্রকে বিষ খাইয়ে মারে, নিজেও মরে। পাকিস্থানের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাওয়া, ভারতকে নির্মুসলমান করতে যাওয়া সেই জাতীয় ব্যাপার। পাগলামি একদিন সারবে। সেদিন অনুতাপ করবে।”

“তুমি তো বাস্তববাদী নও। যদি দেখতে তাদের চেহারা তা হলে নিশ্চিত হতে। তোমার পাকিস্থানের জনগণ তো জানোয়ার। আর এখানকার নেড়েরা—”

“যাক, তা হলে আসছে বারের ভোটের সময় গান্ধীজীর নাম মুখে আনবে না তোমরা। কেমন, ঠিক তো?” বিনু তর্কের মোড় ঘুরিয়ে দিল।

প্রত্যয়

"ভোটের সময়," তিনি বললেন, "ওদের অন্য রকম চেহারা। যে হাত দিয়ে মানুষ খুন করেছে, ঘরে আগুন লাগিয়েছে, সেই হাতেই গান্ধীবাবার বাক্সে ভোট দেবে ওরা। আমরা বাস্তববাদী কিনা, তাই কার কোথায় দুর্ব্বলতা ঠিক ধরতে পারি।"

"তোমরা যেমন তাদের এক ধরণের দুর্ব্বলতার সুযোগ নিচ্ছ তেমনি তাদের আরেক ধরণের দুর্ব্বলতার সুযোগ নিচ্ছে অন্য লোক। নইলে তারা এমন বর্ব্বর হতো না। কিন্তু মানুষের দুর্ব্বলতার উপর রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গেলে সে রাজ্য টেকে না। দেখলে না ইংরেজের দশা? দেখে শিখলে না? বাস্তববাদী হিসেবে ওদেরও সুযশ ছিল, কিন্তু অপরের দুর্ব্বলতার সুযোগ নিলে প্রবল প্রতাপেরও পতন হয়।"

"তা বলে," বাস্তববাদী অনুযোগ করলেন, "কেমন করে আমরা গান্ধীজীর পরীক্ষা চালাতে যাই? রাষ্ট্রের দায়িত্ব যাদের কাঁধে কেমন করে তারা অহিংসা নীতি প্রয়োগ করবে? কেমন করেই বা তারা মিলের বদলে চরকা, রেলের বদলে গোরুর গাড়ী ব্যবস্থা করবে? করতে গেলে দেখবে লোকে নারাজ। ধনিকদের দিক থেকে বাধা আসবে, তা তো বুঝতেই পারো। বাধা আসবে শ্রমিকদের দিক থেকেও। তারা গ্রামে ফিরে গিয়েও অত মজুরি পাবে না। এমন স্বাচ্ছন্দ্য পাবে না। কেবল যে উৎপাদকরাই বাধা দেবে তা নয়, বাধা দেবে উপভোক্তারাও। মিলের কাপড় যেমন সস্তা যেমন হাল্কা, যেমন সহজে কাচা যায়, যেমন ছেঁড়ে কম, চরকার সুতোর খদ্দর তেমন নয়। তুমি যদি আইন করে গ্রামের লোকের উপর খদ্দর চাপিয়ে দিতে যাও তা হলে দেখবে খদ্দরের

খাণ্ডবদাহন হবে। আমরা বলি আগে জনমত গঠন করো, তার পরে ধীরে ধীরে—”

“ধানকল তেলকল চিনির কারখানা সম্বন্ধেও তুমি সেই কথা বলবে। তার মানে সবুর করতে হবে অনন্তকাল। হাতে গবর্ণমেণ্ট এসেও কোনো পরিবর্ত্তন ঘটল না। এর কারণ কী, বলব? ইচ্ছা থাকলে উপায় থাকে। তোমাদের যে ইচ্ছাই নেই। তোমরা বোঝ লোকের দুর্ব্বলতা। লেনিন যদি তাই বুঝতেন তা হলে ইতিহাসে এত বড় একটা পরিবর্ত্তন আনতে সাহস পেতেন না। গান্ধী যদি তাই বুঝতেন তা হলে সশস্ত্র সরকারের সঙ্গে সংগ্রাম করবার জন্যে নিরস্ত্র জনতাকে আহ্বান করতেন না। জনগণ দুর্ব্বলও বটে, সবলও বটে। তাদের সবলতার কাছে আবেদন করলে দেখবে তারা সব রকম ত্যাগ স্বীকারে রাজি। মিলের কাপড় ত্যাগ করতে পারবে না? কারখানার রোজগার ত্যাগ করতে পারবে না? পারবে সবই, যদি বিশ্বাস করে যে এসব তাদের দেশের জন্যে ত্যাগ। কিন্তু আজ যারা তাদের কাছে আবেদন করছে তারা করছে ধর্মের নামে, দলের নামে। স্বাধীনতার পরে দেশকে তো তারা ভুলে যেতে বসেছে।” বিনু আক্ষেপ করল।

বাস্তববাদী বললেন, “হাঁ, তোমার কথা হয়তো সত্য। কিন্তু এসব করতে গেলে কলওয়ালাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা কী রকম দাঁড়াবে, ভেবে দেখেছ?”

“চিয়াংকাইশেকের সঙ্গে তাঁর শ্বশুরগোষ্ঠীর মতো নয়!” বিনু পরিহাস করল।

"তুমি কি মনে করো শ্বশুরগোষ্ঠীর সঙ্গে ঝগড়া করলে চিয়াং টিকে থাকতে পারতেন ?"

"পারতেন না হয়তো, কিন্তু এখন যে সবান্ধবে পলায়ন ।"

"না, না, হাসির কথা নয়। ধনীর সঙ্গে ঝগড়া করা গান্ধীজীও পছন্দ করতেন না।"

বিনু বলল, "বিনা কারণে কারো সঙ্গে ঝগড়া করতে নেই। কিন্তু ভারতের অধিকাংশ লোক বাস করে গ্রামে। অথচ সেখানে তাদের জীবিকা বলতে আছে একমাত্র কৃষি। তাও বছরে ছ'মাস। কৃষির সঙ্গে শিল্প যতদিন ছিল ততদিন তারা স্বাবলম্বী ছিল। এখন তারা বাইরে থেকে শিল্পজাত দ্রব্য নেয়, তার বিনিময়ে দেয় কৃষিজাত দ্রব্য। ফলে তাদের খোরাক কম পড়ে। উন্নততর কৃষি দিয়ে এর সমাধান আংশিকভাবে হবে। কিন্তু পূর্ণ সমাধান হবে গ্রামে গ্রামে শিল্প প্রবর্ত্তন করলে। তা হলে গ্রামের অন্ন গ্রামে থাকবে। গ্রামের লোক খেয়ে বাঁচবে।

"আর আমরা ?" বাস্তববাদী আঁতকে উঠলেন। "আমরা না খেয়ে মরব ?"

"আমরা," বিনু হেসে বললে, "তখন হোটেলে না গিয়ে গ্রামে যাব খেতে। মানুষ যেখানে খেতে পায় সেখানে ঘর বাঁধে। শহরে খেতে পাচ্ছে বলে শহরে বাসা করেছে, খেতে না পেলে শহর খালি করে গ্রামে গিয়ে জুটবে। তবে তোমার ভয় নেই। গ্রামে যে সব [illegible] তৈরি হবার নয়, অথচ চাইই চাই, সে সব জিনিসের বিনিময়ে গ্রামের

লোক তাদের বাড়তি খাদ্য শহরের জন্যে ছাড়বে। শহরের লোকসংখ্যা কমবে, কিন্তু শহর একেবারে উজাড় হবে না। কলকাতায় লাখ দশেক লোক যথেষ্ট।"

বাস্তববাদী কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসলেন। তারপরে বললেন, "তা হলে তুমি ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে দিতে চাও। ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রেভোলিউশন উল্টে দিয়ে দেশকে ফিরে যেতে বল অষ্টাদশ শতাব্দীতে। এটা কি সম্ভব না সঙ্গত ?"

"সম্ভব ও সঙ্গত। কিন্তু গ্রামে ফিরে যাওয়া মানে পিছনে ফিরে যাওয়া নয়। এটাও অগ্রগতি। আধুনিক বিজ্ঞানের উদ্ভাবন একদিনের জন্যে বদ্ধ থাকবে না। এতদিন সে শহরের সেবায় লেগেছে, এখন থেকে লাগবে গ্রামের সেবায়। তার ফলে যা ঘটবে সেটাও এক প্রকার ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রেভোলিউশন। চরকা বলতে আমি শুধু চরকা বুঝিনে, বুঝি গ্রামের লোকের নিত্য ব্যবহার্য্য যে কোনো বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি—বিদ্যুতের দ্বারা, বাষ্পের দ্বারা চালিত হলেও আপত্তি নেই। কিন্তু একই লোক হবে একাধারে মালিক ও শ্রমিক। যে ক্ষেত্রে ষোল আনা মালিক হওয়া সম্ভব নয় সেখানে অংশীদার হবে, তথা শ্রমিক হবে। শ্রম ও ধন দুই স্বতন্ত্র ভাগে বিভক্ত হবে না। তা যদি হয় তবে গ্রামে ফিরে যাওয়া ব্যর্থ হবে।"

"আমি কেবল ভাবছি এর চেয়ে কমিউনিজম ভালো। ওরা তো আমাকে শহর ছেড়ে যেতে বাধ্য করবে না। কলকাতা ছেড়ে আরাম-

বাগ যেতে হবে শুনলেই আমার গায়ে জ্বর আসে। সেখানে গিয়ে বাস করতে হবে! তা হলেই হয়েছে।"

"কিন্তু ভোটের সময়?"

"ভোটের সময়?" বাস্তববাদী চাঙ্গা হয়ে উঠলেন, "ভোটের সময় আমি যে কোনো চুলোয় যেতে রাজি। হাইকমাণ্ড যদি টিকিট দেয় তা হলে আমি আলিপুর ডুয়ার্স থেকে দাঁড়াব। যমে মানুষে টানাটানি করলেও আমি বেঁচে ফিরে আসব কলকাতায়। তারপরে আবার পাঁচ বছর পরে আমার ভোটারদের সঙ্গে দেখা।"

(১৯৫০)

আমরা তা হলে কী করব

১৯১৭ সালে দুনিয়ার যেখানে যত ধনপতি ছিলেন সকলের বুকের রক্ত মুখে উঠল। তাঁরা অবাক হয়ে দেখলেন আকাশে এক ধূমকেতুর উদয় হয়েছে। প্রথম প্রথম তাঁদের ধারণা ছিল ইতিহাসের গগনে অমন কত উদয় হয়েছে, উদয়ের পর অস্ত গেছে। এবার কিন্তু অস্ত যাবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। তখন তাঁরা শঙ্কিত হলেন। এ কি তা হলে সেই ধূমকেতু জয়দেব কবির কল্পনায় যে ছিল কল্কি অবতারের প্রতিরূপ ?

ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালং
ধূমকেতুমিব কিমপি করালং
কেশব ধৃতকল্কিশরীর। জয় জগদীশ হরে।

শঙ্কা সবচেয়ে বেশী জার্মান ধনপতিদের। কারণ ১৯১৮ সালে তাঁদেরও ঘরোয়া আকাশে ধূমকেতুর উদয় হয়েছিল, স্থিতি হয়নি। আবার যদি আসে! পাশের বাড়ীর আকাশে যিনি জ্বলছিলেন তিনি যখন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সিদ্ধিলাভ করলেন তখন তাঁরা প্রমাদ গণলেন। এই সময় এক রণপতির আবির্ভাব ঘটে। ইনি দশ বারো বছর ধরে এই লগ্নটির জন্যে পঁয়তারা কষছিলেন। স্বদেশের গণপতিদের ঠেঙিয়ে ঠ্যাং ভেঙে দেবার পর এঁর এমন বাড় বাড়ল যে ধনপতিরা

সহজেই বিশ্বাস করলেন এঁর মতো লাঠিয়াল থাকতে ধূমকেতুর ভয় নেই।

কিন্তু জার্মানীকে শক্তিসঞ্চয় করতে দেখে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের বিশ্বাস হলো না যে মুদ্গরটি শুধু স্বদেশের গণপতিদের উরুভঙ্গের পর শান্ত হবে। রাশিয়ারও বিশ্বাস হলো না যে জার্মানীর রণবল সন্ধিনির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে নিবদ্ধ থাকবে। আরেক দফা বলপরীক্ষার জন্যে ইউরোপের মহা-শক্তিরা প্রস্তুত হতে লাগলেন। তারপর যা ঘটল তা ধাপে ধাপে যুদ্ধের দিকে এগোনো। শেষে যুদ্ধ।

ইংলণ্ড ও আমেরিকার শ্রমিকরা যেভাবে আহারনিদ্রা ত্যাগ করে কাজে লেগে গেল তা লক্ষ্য করে সেসব দেশের ধনপতিদের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। ধরো, যুদ্ধের পরে যদি এই লক্ষ্মী ছেলেগুলিকে অধিকতর অন্নবস্ত্র দেওয়া হয় তা হলে কি এরা অধিকতর পরিশ্রম করে অধিকতর উৎপাদন করবে না? তা যদি করে তবে আর ভাবনা কিসের? সমস্যার সমাধান তো হয়েই রয়েছে। ইংলণ্ড আমেরিকার ধনপতিদের সঙ্গে সেসব দেশের গণপতিদের যেমন গলায় গলায় ভাব তা দেখে কেউ বিশ্বাস করবে না যে মার্ক্স্ মুনির ভবিষ্যদ্বাণী সেসব দেশেও সত্য হবে। কিন্তু যদি জার্মানীতে হয়! না, তা হতে দেওয়া হবে না। জার্মানী দখল করতে হবে। ততকাল ধরে দখল যত কাল সঙ্কটের আশঙ্কা। জার্মানী যদি রাশিয়ার পথ ধরে তবে ফ্রান্স কি ধরবে না? ফ্রান্স যদি সে পথের পথিক হয় তবে ইংলণ্ড কি বিপথগামী হবে না? আর ইংলণ্ড যদি গোল্লায় যায় আমেরিকা কি সঙ্গদোষ এড়াতে পারবে?

সেইজন্যে জার্মানী দখল করার জন্যে যেন আমেরিকারই গরজ সব চেয়ে বেশী। অবশ্য এর সঙ্গে জুটেছে প্রতিযোগী যন্ত্রশিল্পকে করতলগত করার অভিসন্ধি। এবং রাশিয়ার সঙ্গে ব্যালান্স অফ পাওয়ার। আস্ত জার্মানীটাই যদি রাশিয়ার দিকে ঝোঁকে তা হলে বাটখারার ভারসাম্য থাকে না। সমস্তটা দখল করতে পারলেই চমৎকার হতো, কিন্তু তা যখন সম্ভব নয় তখন অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ।

ওদিকে যেভাবে উৎপন্ন সামগ্রী অগ্নিসাৎ হচ্ছে অধিকতর উপাদান সত্ত্বেও উৎপাদক শ্রেণীর উদর ও পৃষ্ঠ অধিকতর নিকটবর্ত্তী হয়ে আসছে। যুদ্ধটা এইবেলা মধুরেণ সমাপয়েৎ হলেই বাঁচি। যদি আরো দু'বছর গড়ায় তা হলে ঐ যে মধুর সমাধানটি ওটি তেমন মুখরোচক হবে না। শ্রমিক যখন বখরা চাইবে ধনিক বলবেন, "তুমি তো বড় লক্ষ্মী ছেলে নও হে।" তখন ক্যাপিটালিজম ছদ্মবেশী ফাসিজম হয়ে উঠবে। ঠিক এই অভিজ্ঞতাটি ভারতবর্ষেরও হতে পারে। যদি হয়, তবে আমরা কিন্তু উভয়সঙ্কটে পড়ব।

সঙ্কটের দিন আমরা যারা মধ্যবিত্ত আমরা কি কোনো একটা পক্ষ নেব? না আমরা বরের ঘরের পিসী ও কনের ঘরের মাসী হব? এ ছাড়া আরো দুটো বিকল্প আছে। এক, দূরে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখা। দুই, দু'হাত দিয়ে দু'পক্ষকে ধরে ছাড়িয়ে দেওয়া। কিন্তু তাতে বিপদ আছে। দু'পক্ষের চাপে গুঁড়িয়ে যাওয়া সম্ভবপর। পাঠক, তুমি হয়তো সরে দাঁড়াবে, আমি কিন্তু সেটি পারব না। আমি ওদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হয় দু'হাত দিয়ে ওদের ছাড়াছাড়ি ঘটাব, নয় দুপক্ষের

চাপে গুঁড়ো হয়ে যাব। আমি মধ্যবিত্ত না, মধ্যস্থ হব বলে স্থির করে রেখেছি। যদি দরকার হয়। মধ্যবিত্তরা দু'পক্ষের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খায়। আর মধ্যস্থরা খায় দু'দিক থেকে মার। মধ্যস্থ যারা হবে তারা ন্যায়পরায়ণ হবে। তারা পদে পদে ন্যায় অন্যায় বিচার করবে, যার অন্যায় তাকে সেকথা বোঝাবে, যার দিকে ন্যায় তাকে নৈতিক সমর্থন জানাবে, এবং এর দরুণ উভয় পক্ষের লাথিটা কিলটা বখশিষ পাবে। তাদের কপালে আর কোনো পুরস্কার নেই।

২

উপরের অংশটি যুদ্ধের সময় লেখা। বোধহয় ১৯৪৪ সালের শেষে কিম্বা ১৯৪৫ সালের প্রারম্ভে। তারপর আমার অলক্ষে আমার একখানা পুরোনো খাতার পাতায় লুকিয়েছিল। এই সেদিন নজরে পড়ল। অল্পস্বল্প পরিবর্তন করে প্রকাশ করছি।

এখন এই পাঁচ বছরের হিসাব নিকাশ করা যাক।

আমেরিকা যা চেয়েছিল তা পেয়েছে। জার্মানীর আধাআধি দখল করে বিপ্লবকে ঠেকিয়ে রেখেছে। কিন্তু ইংলণ্ড যা চেয়েছিল তা পায়নি। বিপ্লবকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে নি। তার নিজের ঘরেই ছোটখাট একটা বিপ্লব ঘটে গেছে। তার সাম্রাজ্যের একাংশ স্বাধীন হয়েছে। সেও একরকম বিপ্লব। তা হলেও ইংলণ্ড এখনো তার সনাতন ব্যালান্স অফ পাওয়ার তত্ত্বে বিশ্বাসবান। জার্মানীকে সে উঠতে দেবে না।

জার্মানদের শক্তিবৃদ্ধি দেখলেই সে ভয় পাবে। তারা নাৎসী হলেও যে ভয় তারা কমিউনিস্ট হলেও সেই ভয়। এমন কি তারা অখণ্ড হলেও সেই ভয়। জার্মান জাতিটাই একটা আতঙ্ক, কেবল ইংলণ্ডের চোখে নয়, ফ্রান্সের চোখেও! অথচ জার্মানীকে চিরকাল পার্টিশন করে রাখা যাবে না। ইংরেজ ফরাসী কি তা বোঝে না? বোঝে ঠিকই। কিন্তু ভয় যে যায় না।

জার্মানীর বল ধীরে ধীরে ফিরছে। আর কয়েক বছর পরে সে যদি ইচ্ছা করে তবে নিজের চেষ্টায় অখণ্ড হতে পারে। কিন্তু ইচ্ছা কি তার আছে? ইচ্ছা যেমন বাঙালী হিন্দু মুসলমানের নেই তেমনি জার্মান নাৎসী কমিউনিস্টের নেই। একদা যেমন প্রোটেস্টাণ্টে ক্যাথলিকে মিলে জার্মানীকে খণ্ড খণ্ড করেছিল এখনো তেমনি নাৎসীতে কমিউনিস্টে মিলে করতে পারে। জার্মানীর নিজস্ব অন্তর্বিরোধ তার অখণ্ড হবার ইচ্ছা কেড়ে নিয়েছে। তার অন্তর্বিরোধের নিষ্পত্তি সেবারে তো হয়নি, এবারে কি হবে! যতদূর দৃষ্টি যায় জার্মানীকে বিভক্ত হয়েই থাকতে হবে, তবে পরাধীন হয়ে নয়। তার পরাধীনতার শিকল খসে পড়বে।

ওদিকে বৃহত্তর পটভূমিকায় শক্তিপরীক্ষার যে আয়োজন চলছে তা লক্ষ করে কেউ স্থির থাকতে পারছে না। প্রত্যেককেই চিন্তা করতে হচ্ছে, আমি কোন পক্ষে যাব। চীনারা ইতিমধ্যেই এর একটা উত্তর দিয়েছে। ওরা কমিউনিস্ট হয়েছে, রুশ পক্ষে যাবে। ভারতীয়রা মুখে বলছে, আমরা কোনো পক্ষে যাব না। আমরা কমিউনিস্টও না। কথাটা সত্য। সুতরাং অবিশ্বাস করবার কারণ নেই। কিন্তু এখনো

প্রত্যয়

আমাদের টিকি ইংরেজদের পাউণ্ড স্টার্লিংএর সঙ্গে বাঁধা। আর্থিক বিপর্যয়ের ভয়ে আমরা কোনদিন কী করে বসব তা আমরাই চব্বিশ ঘণ্টা আগে জানতে পাব না। এটা যে সত্য তা কি অস্বীকার করবার উপায় আছে? ডিভ্যালুয়েশনের নাটকীয়তা এখনো বাসি হয়নি।

আর্থিক বিপর্যয় এড়িয়ে চলতে চাই, এই যদি আমাদের মনের কথা হয় তবে মুখের কথা যাই হোক না কেন যুদ্ধে আমরা জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হব। অপর পক্ষে, যুদ্ধ এড়িয়ে চলতে চাই, এই যদি আমাদের মনের কথা হয় তা হলে আর্থিক বিপর্যয়ের জন্যে এখন থেকে মনটাকে তৈরি করতে হবে। তার মানে পাউণ্ড স্টার্লিংএর সঙ্গে টাকার সাত পাকের সম্পর্ক এক দিন না এক দিন কাটাতে হবে ও তার ফলভোগ করতে হবে। পাকিস্তান পাউণ্ডের মায়া কাটিয়েছে, কিন্তু ডলারের মায়া কাটায়নি। ডলারের সঙ্গে তার সম্পর্ক তেমনি রয়েছে। তার দাড়ি ডলারের সঙ্গে বাঁধা। তাকেও মনঃস্থির করতে হবে, কোনটা শ্রেয়ঃ। যুদ্ধে যোগদান, না আর্থিক বিপর্যয়।

ভারত ও পাকিস্তান উভয়ের সম্মুখে এই একই প্রশ্ন: এত বড় প্রশ্ন আর নেই। কে কী ভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দেয় তার উপর নির্ভর করছে সমস্ত ভবিষ্যৎ। উত্তর দেওয়া যে কত কঠিন তা আমি জানি ও বুঝি। কিন্তু তা বলে নিরুত্তর তো থাকা যায় না। এক দিন না এক দিন উত্তর আমাদের দিতেই হবে। উত্তর যদি হয় যুদ্ধে যোগদান তা হলে আর্থিক বিপর্যয় হয়তো ঘটবে না। কিন্তু বাধবে অন্তর্বিরোধ। ভারতের আত্মা যুদ্ধ চায় না। ভারত শান্তিকামী। ভারতের জনগণ

একটা যুদ্ধের বিরুদ্ধাচরণ করেছে গান্ধীনেতৃত্বে। আরেকটা যুদ্ধের প্রতিকূলতা করবেই, কার নেতৃত্বে জানিনে।

পক্ষান্তরে যুদ্ধে যোগদান না করলে আর্থিক বিপর্যয়ের জন্যে দেশশুদ্ধ লোককে সময় থাকতে প্রস্তুত করতে হবে। অতি দুরূহ কাজ। খাদ্য আমদানি বন্ধ হতে যাচ্ছে, এক এক করে অনেক কিছুর আমদানি বন্ধ হবে। আমদানি বন্ধ হলে রপ্তানি বন্ধ হতে বাধ্য। দেশের কাঁচামাল দেশের কলকারখানায় ব্যবহার করতে হবে। কলকারখানারও বিকেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন হবে। তাতে বণ্টনের সুবিধা।

সঙ্গে সঙ্গে টাকার পরিমাণ ও প্রচলন কমাতে হবে। বিনিময় চলবে যথাসম্ভব বার্টার প্রথায়। এবং চরকার সুতোর মাধ্যমে। বাড়ীতে বাড়ীতে শিল্প ও কৃষি চর্চ্চা ব্যাপক হবে। পরচর্চ্চার সময় থাকবে না। সিনেমার টিকিট পেতে হলে চরকার সুতো দাখিল করতে হবে। পরিবারের সকলে যদি একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে খায় তা হলে রান্নার সময় বাঁচে, কয়লার খরচও। কয়েকটি পরিবার মিলে একসঙ্গে রান্নার আয়োজন করতে পারেন। রোজ না হোক হপ্তায় এক দিন।

ইচ্ছা থাকলে উপায় থাকে। যুদ্ধে যোগদান করব না এই যদি হয় সংকল্প তা হলে তার আনুষঙ্গিক আর্থিক বিপর্যয় আমাদের অকল্যাণ করবে না। বরং আমরা সেই সুযোগে নতুন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করব। সে ব্যবস্থার সার কথা, যে কাজ করতে চায় সে কাজ পাবে, যে কাজ করতে চায় না সে দেশ ছেড়ে আর কোথাও যাবে। আমরা কাউকে বসে থাকতে দেব না। এমন কি সাধু সন্ন্যাসীকেও না। তাঁরা ইচ্ছা

করলে হিমালয়ে যেতে পারেন, কিন্তু লোকালয়ে থাকলে কাজে হাত লাগাতে হবে। কয়েক জন খাটবে আর বাকী সকলে খাবে, এ ব্যবস্থা আমাদের পারিবারিক জীবন দুর্বহ করেছে, আমাদের জাতীয় জীবনকেও দুর্বহ করে তুলবে। যারা রেশন পাচ্ছে তারা খেটে খাচ্ছে কি না খবর নিতে হবে। যদি দেখা যায় খাটছে না তা হলে খাটুনির ব্যবস্থা করে দিতে হবে। তা যে কলকাতা শহরেই হবে এমন কোনো কথা নেই। অধিকাংশকেই গ্রামে চালান দিতে হবে। না গেলে রেশন মিলবে না।

এ দেশের প্রধান শত্রু জড়তা। স্বাধীন হয়েও এর জড়তা কাটেনি। জড়তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে অন্ধ কুসংস্কার। ধর্মের নামে তার অসীম প্রতিপত্তি। সে যদি দেশের চিত্ত অধিকার করে থাকে তা হলে আমাদের জড়তা ও আমাদের মূঢ়তা মিলে আমাদের দুই হাত ও দুই পা জড়িয়ে ধরবে। আমরা খাটতে পারব না, আমরা হাঁটতে পারব না। কেবল বক্তৃতা দেব, কেবল বিবৃতি ছাপাব। তার পর অবস্থা যখন ঘোরালো হয়ে উঠবে তখন ফস্ করে এক দিন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ব। যেন যুদ্ধই হচ্ছে সব সমস্যার সমাধান।

অবশ্য আমি ধরে নিয়েছি যে আর একটা বিশ্বযুদ্ধ অনিবার্য। অনেকের বিশ্বাস দু'পক্ষেরই যখন আণবিক বোমা আছে তখন কেউ সাহস করে লড়াই শুরু করবে না। কিন্তু জার্মানী কি জানত না যে প্রতিপক্ষের বিষবাষ্প আছে? কেন তা হলে লড়াই শুরু করল? করল এই জন্যে যে সেই মুহূর্তে তার বল ছিল তার প্রতিপক্ষের চেয়ে বেশী। দেরি করলে তার প্রতিপক্ষের বল তার চেয়ে বেশী হতো। অর্থাৎ

প্রত্যয়

তার প্রতিপক্ষের বল যে হারে বাড়ছিল তার নিজের বল সে হারে বাড়ছিল না। বলপরীক্ষায় সে হেরে যেত, যদি দেরি করত। শেষ পর্যন্ত হেরে গেল এই জন্যে যে তাড়াতাড়ি শুরু করলেও তাড়াতাডি সারা করতে পারল না। সারা করতে তার যতই দেরি হতে থাকল তার প্রতিপক্ষের বল ততই বাড়তে থাকল। আসছে বারের যুদ্ধ সেই আরম্ভ করবে যার বল একটা বিশেষ মুহূর্তে প্রতিপক্ষের চেয়ে বেশী থাকবে, পরবর্তী মুহূর্তে থাকবে না। আণবিক বোমাই সামরিক বলের একমাত্র মাপকাটি নয়। দু'পক্ষের বল যদি সমস্তক্ষণ সমান থাকে তা হলে অবশ্য কেউ আরম্ভ করবে না, উভয়েই অপেক্ষা করবে। কিন্তু বল কখনো সমস্তক্ষণ সমান থাকে না। সুতরাং যুদ্ধ অনিবার্য।

যদি না ইতিমধ্যে অন্তঃপরিবর্তন ঘটে। তার সম্ভাবনা যে নেই তা নয়। গান্ধীজী আমাদের শিক্ষা দিয়ে গেছেন অন্তঃপরিবর্তনে বিশ্বাস রাখতে। আমরা বিশ্বাস রাখব।

(১৯৫০)

আমি কী বিশ্বাস করি ও করিনে

যে কথা আমি বিশেষ করে বলতে চাই সে কথা বলার সময় হয়তো পেরিয়ে যাচ্ছে, তবু সে কথা বলতে পারছিনে। আমার কণ্ঠস্বর আমাকে অর্জন করতে হবে তার আগে। যার কণ্ঠস্বর নেই তার কথা হাজার ভালো হলেও কেউ কান দিয়ে শোনে না। বন্ধুরা ব্যথা পায়, শত্রুরা ব্যথা দেয়, জনতা যেমন উদাসীন তেমনি উদাসীন থাকে।

এইজন্যে আমি নীরব। কিন্তু নীরবতাও শ্রেয়স্কর নয়। লোকে ভুল বুঝতে পারে। অনর্থের দিন যে মানুষ মৌনব্রত অবলম্বন করে তার উপর অবিচার হওয়া স্বাভাবিক। যে লেখক দুনিয়ার আর সমস্ত বিষয়ে লিখছে অথচ নিজের দেশ সম্বন্ধে লিখছে না সে তার কর্তব্য করছে কি না এ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। সে যদি কোনো বিষয়ে কিছু না লিখত, লেখা একদম বন্ধ করে দিত, তা হলে হয়তো জবাবদিহির দায়ে পড়তে হতো না। পড়লে উত্তর দেওয়া যেত, আমি তো আর লেখক নই, আমি দর্শক।

এসব ভেবে আমাকে অকালে মৌনভঙ্গ করতে হচ্ছে। কিন্তু অল্পস্বল্প মৌনভঙ্গ। এর বেশী করা উচিত নয়। এটুকু যে করছি এ শুধু নিজের উপর অবিচার খণ্ডাতে।

প্রত্যয়

আমি বিশ্বাস করি যে বাংলার হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রীস্টান সকলেই বাঙালী ও সকলে মিলে একজাতি। দেশ ভাগ হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু জাতি ভাগ হয়নি। জাতি ভাগ করা শিবের অসাধ্য। যা হবার নয় তা হবেও না। মাঝখান থেকে অনাবশ্যক দুঃখ পাবে কয়েক লক্ষ অভাগা। তাদের দশা এখন গিনিপিগের মতো। তাদের উপর দিয়ে যে যা খুশি পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে। এসব পরীক্ষার একমাত্র মূল্য এগুলির ব্যর্থতা সম্বন্ধে পরীক্ষার্থীদের শিক্ষালাভ। তারা একদিন শিখবে যে ঘরবাড়ী ছেড়ে দৌড় দিলে লাভ যা হয় তার চেয়ে লোকসান হয় অনেক বেশী। প্রাণ হয়তো বাঁচে, কিন্তু ভিতরের মানুষটা মরে যায়। অমন করে বেঁচে থাকার চেয়ে ঘরবাড়ী মান ইজ্জৎ বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ দেওয়া ভালো। শেষ পর্যন্ত এই শিক্ষাই মনে বসবে। তখন দৌড়াদৌড়ি আপনি কমে আসবে। তখন ঘরবাড়ী মান ইজ্জৎ বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ দেবার প্রতিজ্ঞা মনে জাগবে। দু'চার হাজার লোক প্রাণ দেবেও। তাদের প্রাণদান হবে এদের পলায়নের চেয়ে অনেক বেশী মহনীয়, অনেক বেশী ফলপ্রদ। সারা জগতের মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করবে তাদের বীরত্ব। অন্যায়কারী তখন মুখ দেখাতে পারবে না। অন্যায়ের অন্ত হবে। যে যার নিজের ভিটায় বাস করবে, নিজের বৃত্তি অনুসরণ করবে। জাতি যদি ভাগ না হয় তা হলে একদিন একজাতিবোধ হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রীস্টানকে একসূত্রে বাঁধবে। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি তাদের আলাদা করে রাখতে পারবে না। গবর্ণমেণ্ট আলাদা হতে পারে, কিন্তু জীবন আলাদা হবে না। প্রকৃতি যাদের এক করেছে মানুষ তাদের

ভিন্ন করতে পারে না। তা যদি পারত তবে হাজার বছরের ইতিহাস অন্য রকম হতো।

ফরাসীরা বলে থাকে তাদের দেশ এক ও অবিভাজ্য। আমিও এককালে বলেছি বাংলাদেশ এক ও অবিভাজ্য। এখনো আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি যে চোখে যা দেখছি তা সত্ত্বেও বাংলাদেশ এক ও অবিভাজ্য। তা বলে আমি গায়ের জোরে তার মানচিত্র বদলে দিতে চাইনে। প্রথমত, আমি গায়ের জোরে বিশ্বাস করিনে। অমন করে কিছু সাময়িক সুরাহা হতে পারে, কিন্তু ত্রিশ চল্লিশ বছর পরে আবার এ দেশ ভাগ হবে, যদি ভাগাভাগির মনোভাব অতৃপ্ত থেকে যায়। লীগপন্থী মুসলমানদের বদ্ধমূল ধারণা চাকরিবাকরি ব্যবসাবাণিজ্য শিক্ষা-দীক্ষা সব কিছু হিন্দুদের একচেটে, স্বাধীনতার আন্দোলনে যোগ দিয়ে হিন্দুদের কাছ থেকে যা পাওয়া যাবে পাল্টা আন্দোলন করে ইংরেজের কাছ থেকে পাওয়া যাবে তার চেয়ে আরো বেশী, দেশ যদি ভাগ হয়ে যায় তা হলে তো দেশের একাংশের শিক্ষাদীক্ষা চাকরিবাকরি ব্যবসাবাণিজ্য সব কিছু হবে মুসলমানের একচেটে। এই যে বদ্ধমূল ধারণা একে গায়ের জোরে উন্মূল করা যায় না। সাধারণ মুসলমানকে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে হবে যে শিক্ষাদীক্ষায় চাকরিবাকরিতে ব্যবসাবাণিজ্যে তার যেমন ভাগ নেই তেমনি সাধারণ হিন্দুরও ভাগ নেই। অধিকাংশ হিন্দুই অধিকাংশ মুসলমানের মতো ভাগ্যহীন। এর যদি কোনো প্রতিকার থাকে তবে তা দেশবিভাগে নয়, জাতিবিভাগে তো নয়ই। সাধারণ মুসলমান যেদিন বুঝবে যে দেশবিভাগ করে লাভ যা হয়েছে তা সাধারণের নয়,

অসাধারণদের, সেদিন সে নিজেই পাকিস্থানের প্রতিবাদ করবে। আর যদি বাস্তবিক সাধারণ মুসলমানের তাতে উন্নতি হয় তবে পাকিস্থানের বিরুদ্ধে আমাদের যে প্রতিবাদ আমরা তা প্রত্যাহার করব। কিন্তু সে উন্নতির অংশ সাধারণ হিন্দুও যেন পায়। সাধারণ হিন্দুকে বঞ্চিত করে সাধারণ মুসলমানের যে উন্নতি বা সাধারণ মুসলমানকে বঞ্চিত করে সাধারণ হিন্দুর যে উন্নতি তা এমন অস্বাভাবিক যে তা কিছুতেই সম্ভব হবে না, যদি হয় তো স্থায়ী হবে না।

দ্বিতীয়ত, অনেক দিন থেকে আমার বিশ্বাস কলকাতা বাংলাদেশের ধনসম্পদ হরণ করে এনে স্বর্ণলঙ্কার মতো ভোগ করছে, তার ফলে পূর্ববঙ্গেরই ক্ষতি হচ্ছে সব চেয়ে বেশী। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন না পেলে পূর্ববঙ্গ বা উত্তরবঙ্গ শিল্পে বাণিজ্যে অগ্রসর হতে পারবে না। সাধারণের অবস্থার উন্নতি হবে না। তারা কেবল কাঁচামাল জোগাবে ও তৈরি মাল কিনবে। তাদের জন্যে কেউ কোনোদিন ভাবেও না। জাতীয়তাবাদীরা সবাই এসে জুটেছেন স্বর্ণলঙ্কায়। যে চিন্তা আমার মনে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন আকারে অস্পষ্ট ভাবে ঘুরত সেই চিন্তাই এক দিন পাকিস্থান-রূপে অবতীর্ণ হয়ে আমাকেই দিল মর্মান্তিক আঘাত। ধাক্কা সামলাতে আমার দু'তিন বছর লাগল। এত দিনে আমি উপলব্ধি করেছি যে পূর্ব বঙ্গের উত্তর বঙ্গের শিল্প বাণিজ্য একটু আলাদা থাকলেই জমবে ভালো। চট্টগ্রাম একদিন বড় বন্দর হবে। ঢাকা হবে বড় শিল্পকেন্দ্র। খুলনা বরিশাল সিলেট সিরাজগঞ্জ সব একে একে মাথা তুলবে। তার ফলে হয়তো কলকাতার মাথা হেঁট হবে। কিন্তু বাঙালী জাতির সারা শরীরে

রক্ত চলাচল করবে। বাংলাদেশকে সর্বাঙ্গপুষ্ট করতে হলে বিকেন্দ্রীকরণ ছাড়া উপায় নেই। পূর্ববঙ্গকে পৃথক করে বিধাতা তার একটা ব্যবস্থা করে দিলেন। এটা ইতিহাসের ইচ্ছা। এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বৃথা। আমার ভাঙা হৃদয়কে এই বলে আমি সান্ত্বনা দিয়েছি। আর আমি পূর্ববঙ্গকে পশ্চিম বঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করার কথা ভাবিনে। আগে উভয় প্রদেশের শিল্পবাণিজ্য সমান উন্নত হোক। আগে সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার মান আর একটু বাড়ুক। আগে হিন্দু মুসলমানের ঈর্ষাদ্বেষ আর একটু কমুক। তার পরে বাংলাদেশের ভৌগোলিক ঐক্য কার সাধ্য ঠেকায়! এদেশ এক এবং অবিভাজ্য ছিল এবং হবে। কিন্তু মাঝখানকার এই ভাঙনটাও বিধাতার ইচ্ছায় ঘটেছে। মানুষের ইচ্ছা যেন এর সঙ্গে শত্রুতা না করে। এর কাজ শেষ হয়ে গেলে এ আপনি চলে যাবে।

আমি বিশ্বাস করিনে যে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের রক্ষা করার জন্যে যুদ্ধ বাধানো দরকার। যুদ্ধ যদি বাধে সারা ভারত ও সারা পাকিস্থান জুড়ে বাধবে, হয়তো সারা দুনিয়া জুড়ে। নানা রকম সব সমস্যার সম্মুখীন হয়ে দুদিনেই মানুষ ভুলে যাবে পূর্ববঙ্গের হামলা। যুদ্ধ হয়তো পর্যবসিত হবে বিপ্লবে! তখন কে কাকে আশ্রয় দেবে! এখন যারা আশ্রয়দাতা তখন তারাও হবে আশ্রয়প্রার্থী। কেঁচো খুড়তে গিয়ে কেউটের ছোবল খেতে হবে।

আমি বিশ্বাস করি যে বাঙালী হিন্দু মুসলমান এখনো ইচ্ছা করলে মিটমাট করতে পারে। এটা বাঙালীর ঘরোয়া ব্যাপার। এর জন্যে

প্রত্যয়

করাচীর বা দিল্লীর দ্বারস্থ হওয়া লজ্জার কথা। হৃদয়ে প্রেম থাকলে, মস্তিষ্কে শুভবুদ্ধি থাকলে ঢাকা ও কলকাতা ডান হাত ও বাম হাতের মতো অঞ্জলিবদ্ধ হতে পারে। শেষ পর্যন্ত ঘটবেও তাই। আমি বিশ্বাস করিনে যে বাঙালীর ঘরোয়া ঝগড়া আর কেউ মিটিয়ে দিতে পারবে। বা আর কেউ এর দরুন যুদ্ধে নামতে রাজি হবে। যাঁরা চুক্তির উপর ভরসা রাখেন ও যাঁরা যুদ্ধের উপর বাজি রাখেন তাঁদের উভয়ের কপালে আছে হতাশা। অবাঙালীরা একদিন সরে দাঁড়াবেন, তখন বাঙালীরই উপর পড়বে সম্পূর্ণ দায়িত্ব। যেদিন আমাদের সম্পূর্ণ দায়িত্ববোধ জন্মাবে সেদিন প্রেমও জাগবে, শুভবুদ্ধিও সক্রিয় হবে। তখন ঘটবে অঞ্জলিবদ্ধতা।

কিন্তু কবে ?

এর উত্তরে আমি আবার মৌন অবলম্বন করলুম।

(১৯৫০)

সংশয়বাদী

সংশয়বাদী ঘাড় নেড়ে বললেন, "তোমরা রাজ্য চালাতে পারবে না হে, পারবে না। এই না সেদিন বললে, আরো ফসল ফলেছে, খাদ্যের দৌড়ে আমরা অনেকদূর এগিয়ে গেছি। আজ শুনছি চালের মণ চল্লিশ টাকা। কোথায় কোরিয়া বলে একটা ছোট্ট উপদ্বীপ আছে, সেখানে লড়াই বেধেছে বলে বাজার থেকে ওষুধপত্র উধাও, তার মানে চোরাবাজারে তার দাম চার পাঁচ গুণ। বাড়ীতে মশলা কেনা বন্ধ, সিদ্ধ খাচ্ছি। এখন থেকে এই, এর পরে যুদ্ধ যখন ছড়াবে তখন সিদ্ধ খাওয়া চলবে কিনা সন্দেহ। কাঁচা খেতে হবে বোধ হয়। না, খাওয়া দাওয়া ঘুচে যাবে?"

বন্ধু বললেন, "তুমি কেবল খারাপটা দেখ। ভালো কিছু তোমার চোখে পড়ে না। এই যে আমরা এত বড় একটা সাম্রাজ্য চালাচ্ছি, যাকে বলা হতো ভারত সাম্রাজ্য, কেবল ব্রিটিশ আমলে নয়, মোগল আমলে, এর জন্যে আমরা ট্রেনিং পেলুম কবে! বিনা তালিমে মোটর চালাতে গেলে কী হয় জানো তো। শাসনযন্ত্র তার চেয়েও জটিল। আমরা যে এখন পর্যন্ত য়্যাকসিডেণ্ট বাধাইনি এর জন্যে কেউ আমাদের ধন্যবাদ দেবে না। শুধু দোষ ধরবে। যত সব ছিদ্রান্বেষীর দল!"

সংশয়বাদী বললেন, "আহা রাগ কর কেন? স্বাধীনতার আগে

এক বছর ও পরে তিন বছর মোট চার বছর তোমরা মোটর চালাচ্ছ দিল্লীর স্টিয়ারিং হুইল ধরে। তালিমের জন্যে এর চেয়ে বেশী সময় কে কবে পেয়েছে! তুমি যদি মনে করে থাক যে অভিজ্ঞতার অভাবে জিনিসপত্রের দাম কমছে না, বরং বাড়ছে, তা হলে তুমি ভুল বুঝেছ। এটা অভিজ্ঞতার অভাবে নয়, এর অন্য কারণ আছে।”

“কী কারণ?” বন্ধু প্রশ্ন করলেন।

“সে কথা যদি বলি,” সংশয়বাদী উত্তর করলেন, “তোমরা আমাকে কমিউনিস্ট বলে পুলিশে ধরিয়ে দেবে। সেইজন্যে আগে জানতে চাই, ভয়ে বলব, না নির্ভয়ে বলব?”

“তুমি যে কমিউনিস্ট নও তা সকলে জানে। সুতরাং নির্ভয়ে বলো।”

“তা হলে শোন।” সংশয়বাদী বলতে আরম্ভ করলেন “দু'রকম ক্ষমতা আছে। অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক। বণিকের মানদণ্ড আর সম্রাটের রাজদণ্ড। ইংরেজ যখন ছিল তখন তার হাতে ছিল উভয়বিধ দণ্ড। কবির ভাষায়—

‘বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী
রাজদণ্ড রূপে!’

তার মানে যে বণিক সে-ই রাজা, যে রাজা সে-ই বণিক। রাজ্যে বাণিজ্যে একাকার। কিন্তু ইংরেজ যখন চলে গেল তখন তার রাজদণ্ড পড়ল এক দল লোকের হাতে, মানদণ্ড পড়ল আর একদল লোকের হাতে। কেবল যে কংগ্রেস নেতারাই স্বাধীনতা পেলেন তা নয়, স্বাধীনতা পেলেন

দেশী ধনিকরাও। অর্থনীতির ক্ষেত্রে তাঁরাই সর্বেসর্বা। কেউ তাঁদের গায়ে হাত দিতে সাহস পান না। নেতারাও না। নেতাদের সন্তুষ্ট থাকতে হলো রাজনীতি ক্ষেত্রে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা নিয়ে। সে ক্ষমতা এত বেশী ক্ষমতা যে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু ইংরেজের সঙ্গে দু'শ বছর কাটিয়ে আমাদের ধারণা দাঁড়িয়ে গেছে রাজদণ্ড ও মানদণ্ড একই লোকের হাতে থাকা সম্ভব ও সঙ্গত। এত কালের বদ্ধমূল ধারণা তিন বছরেও উৎখাত হলো না। এখনও আমরা আশা করছি রাজশক্তি আমাদের ভাত কাপড়ের অভাব দূর করবে। কিন্তু পারবে কী করে? তার হাতে যে বণিকের মানদণ্ড নেই। কোনো দিন যে অর্থনৈতিক ক্ষমতা তার হাতে আসবে সে ভরসাও আর নেই। যাদের হাতে আছে সে ক্ষমতা তাদের সঙ্গে সমঝোতা করে লোকের যেটুকু উপকার করা যায় সেটুকু সে করছে ও করবে। কিন্তু তাতে লোকের পেট ভরে না। লোকে বুঝতে পারে না যে এরা ইংরেজ নয়, এরা উভয়ত্র সর্বেসর্বা নয়। এরা চোরাকারবার বন্ধ করতে পারে না, সে ক্ষমতা এদের নেই। যাদের আছে তারা বন্ধ করবে না, কারণ সেই ভাবেই তারা নিজেদের মূলধন বাড়ায়। মূলধনই তো তাদের ক্ষমতার মূল। তারা তাদের ক্ষমতার মূলে আঘাত করবে কোন্ দুঃখে! তাদের বাধ্য না করলে তারা কিছু করবে না। কিন্তু তাদের বাধ্য করা কারো সাধ্য নয়। যত দিন না এমন একটা গবর্ণমেণ্ট হচ্ছে যার হাতে উভয়বিধ দণ্ড তত দিন আমাদের চোরাবাজারের প্রজা হয়েই বাঁচতে এবং মরতে হবে।"

প্রত্যয়

বন্ধু বললেন, "এ তোমার অত্যন্ত অন্যায়। চোরাবাজার কোন দেশে নেই? আছে শ্রমিকশাসিত ইংলণ্ডেও। এটা যুদ্ধের অনুষঙ্গ।"

"কিন্তু রাশিয়ায় নেই। কেউ বলছে না যে নতুন চীন রাষ্ট্রে আছে।"

"খোঁজ নিলে দেখবে সেখানেও আছে। হয়তো কম, তবু আছে ঠিক। উৎপাদন যতই বাড়তে থাকবে চোরাকারবার ততই কমতে থাকবে। এটা সময়সাপেক্ষ।"

"উৎপাদন বাড়তে দেওয়া ওদের পক্ষে লাভজনক নয়। কম উৎপাদনেই ওদের বেশী লাভ। উৎপাদন বাড়বে বলে যদি আশা করে থাকো তবে তুমি হতাশ হবে এক দিন। বাড়বে অস্ত্রশস্ত্রের উৎপাদন; অন্নবস্ত্রের নয়।"

"তুমি দেখছি সত্যি কমিউনিস্ট। তোমার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা।"

"জানতুম তুমি শেষ পর্যন্ত ঐ অপবাদ দেবে। যুক্তির বদলে কটূক্তি।" এই বলে তিনি গা তুললেন।

বন্ধু বললেন, "আরে বোস, বোস। অমনি রাগ করা হলো। তুমি কি বলতে চাও অর্থনৈতিক ক্ষমতা আমাদের হাতে নেই বা আসবে না?"

"তোমাদের হাতে থাকলে তার প্রমাণ পাওয়া যেত। নেই তা তো জাজ্বল্যমান! আসবে কিনা সেটা অবশ্য বিতর্কের যোগ্য। তুমি বলবে, আসবে। আমি বলব, আসবে না। তুমি রাগ করে বলবে,

কমিউনিস্ট। আমি রাগ করে বলব, পেতি বুর্জোয়া। যত রকম কটূক্তি। সময়ে বোঝা যাবে কার যুক্তি ঠিক।”

বিনু এতক্ষণ বিনা বাক্যে শুনে যাচ্ছিল। বন্ধু বললেন, “আচ্ছা, বিনুকে সালিশ মানা যাক। কী বলো বিনু? অর্থনৈতিক ক্ষমতা কি ইংরেজ আমাদের হাতে দিয়ে যায় নি? কার হাতে দিয়েছে তা হলে?”

“অর্থনৈতিক ক্ষমতা,” বিনু বলল, “কেউ কাউকে দেয় না, দিতে পারে না। ওটা শাসনযন্ত্রের সামিল নয়, শাসনযন্ত্রের অতিরিক্ত। তোমরা চেয়েছিলে শাসনযন্ত্র, তার অতিরিক্ত পাবে কী করে?”

“ওটা তা হলে আছে কার হাতে?”

“কিছুটা ইংরেজের হাতে, বাকীটা দেশী ধনিকদের হাতে।”

“তাদের হাত থেকে আসবে কী করে?”

“তার উত্তর,” বিনু হেসে বলল, “মার্কস্ দিয়ে গেছেন এক ভাবে, গান্ধী দিয়ে গেছেন আরেক ভাবে, ব্রিটিশ লেবার পার্টি দিচ্ছে আরো এক ভাবে। তোমাদের বিশ্বাস তোমরা চতুর্থ একটা উপায় জানো।”

সংশয়বাদী বললেন, “চতুর্থ উপায় তো চোরের সঙ্গে সমঝোতা। অর্থাৎ চোরাই টাকার উপর ট্যাক্স বসানো। তারপর চোরকে ডেকে বলা, দিয়ে যাও বাপু যে যা পারো। আইন তোমাদের জন্যে নয়।”

বিনু বলল, “তুমি হয়তো অবিচার করলে। যাঁরা রাজ্যের ভার নিয়েছেন তাঁরা যা ভালো বিবেচনা করেন তা করবেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে অমন করে তাঁদের হাতে অর্থনৈতিক ক্ষমতা আসবে কি না। যদি আসে তো কবে আসবে? কেমন?”

বন্ধু বললেন, "হাঁ। এই আমার প্রশ্ন।"

বিনু বলল, "জার্মানীর সোশ্যাল ডেমোক্রাটরাও ওই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে। ইতিহাস তাদের সুযোগ দিয়েছিল বারো তেরো বছর। তারা উত্তর দিতে পারল না বলে ইতিহাস তার পরে সুযোগ দিল নাৎসীদের। ভারতবর্ষে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটবে কিনা ইতিহাস জানে। অর্থাৎ ভগবান জানেন।"

"ভগবান!" সংশয়বাদী বললেন, "কেন বেচারাকে টেনে আনছ এর মধ্যে! আর ইতিহাস! ইতিহাস কি নাৎসীদের সাফ করে দেয়নি?"

"তার মানে," বন্ধু বললেন, "তুমি বলতে চাও যে নাৎসীরা এদেশে কোনো সুযোগ পাবে না। পাবে কমিউনিস্টরা?"

"আরে, না, না।" সংশয়বাদী সন্ত্রস্ত হয়ে বললেন, "এখানেও নাৎসীরা ঘোলা জলে মাছ ধরবার অপেক্ষায় আছে। কিন্তু তাদের জন্যে তোমার কেন এত দরদ!"

"হুঁ! আমাকে নাৎসী বলে ইঙ্গিত করা হচ্ছে!" বন্ধু গোসা করলেন।

বিনু বলল, "থাক, অমন করে পরস্পরকে আক্রমণ করে প্রশ্নের উত্তর মিলবে না। অর্থনৈতিক ক্ষমতার কথা হচ্ছিল। গান্ধীজী জানতেন যে নিছক রাজনৈতিক ক্ষমতায় দেশের কোটি কোটি লোকের পেট ভরবে না। সেইজন্যে অর্থনৈতিক ক্ষমতাও চেয়েছিলেন। কিন্তু ইংরেজের কাছে নয়। তিনি জানতেন যে ইংরেজ তা দিতে পারে না। সেইজন্যে দেশের লোককে বলেছিলেন, তোমরা মিল ফ্যাক্টরীর উপর

নির্ভরতা ছাড়ো। দরকারী জিনিসের জন্যে ধনিকদের উপর নির্ভর কোরো না। ওদের মুখাপেক্ষী হলে ওরাই তোমাদের প্রভু হবে। তখন কোন কাজে লাগবে রাজনৈতিক ক্ষমতা! অন্নে বস্ত্রে স্বাবলম্বী হও। তা হলে দেখবে ওরাই তোমাদের দরজায় ধর্ণা দেবে। আজ গান্ধীজী নেই। কিন্তু তার শিক্ষা তো আমরা ভুলে যাইনি। জিনিস পত্রের দর বাড়ছে, লোকে ভাবছে আরো বাড়বে। আতঙ্কিত হয়ে দরকারের চেয়ে আরো বেশী কিনছে। ফলে আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে দর। এ ক্ষেত্রে কর্ত্তব্য দরকারের চেয়ে বেশী না কেনা। সম্ভব হলে আদৌ না কেনা। এর নাম অহিংস অসহযোগ। কিন্তু এই যথেষ্ট নয়। এই অবসরে প্রত্যেকটি দরকারী জিনিস যাতে ঘরে ঘরে বা গ্রামে গ্রামে তৈরি হয় তার জন্যে কোমর বাঁধতে হবে।"

বন্ধু এর জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। বললেন, "এটা একটা উত্তরই নয়।"

সংশয়বাদী বললেন, "এইবার তোমার সঙ্গে আমি একমত।"

বিনু বলল, "বেশ তো। একজন যাও মার্কসের কাছে, একজন যাও সোশ্যাল ডেমক্রাটদের কাছে। তার পরে যা হবার তা হোক। ভারতের কপালে আছে একটা লঙ্কাকাণ্ড বা কুরুক্ষেত্র। যিনি নিবারণ করতে পারতেন তিনি খুন হয়েছেন। বোধ হয় ভগবানের ইচ্ছা নয় যে কেউ নিবারণ করে। আমি আমার সাহিত্যে মন দিতে চাই। কুরুক্ষেত্রের আগে যেন আমার কাজ আমি সেরে রাখতে পারি।"

(১৯৫০)

দেশপ্রেম বনাম জাতিপ্রেম

ইংরেজীতে দুটি শব্দ আছে—পেট্রিয়টিজম ও ন্যাশনালিজম। পেট্রিয়টিজম মানে দেশপ্রেম। ন্যাশনালিজম মানে জাতিপ্রেম। দেশপ্রেম যে কী বস্তু তা আমরা অনেকদিন পরাধীন থেকে অনেক দুঃখ পেয়ে অনেক দিন সংগ্রাম করে হৃদয়ঙ্গম করেছি। কিন্তু জাতিপ্রেম যে কাকে বলে তা আমাদের এখনো শিখতে বাকী। শিক্ষা তো বিনা দুঃখে হয় না। বহু দুঃখ আছে আমাদের কপালে।

এ দেশে এমন লোক এখনো আছে—তাদের সংখ্যাই বেশী—যারা জাতি বলতে বোঝে ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ ইত্যাদি। দক্ষিণ ভারতে আজকাল জাত দেখে স্কুল কলেজে ভর্তি করা হয়। চাকরির বাজারেও জাত যাচাই করা হয়, যেমন বিয়ের বাজারে। শুনতে পাই বিহারেও পদোন্নতি হয় জাত বিচার ক'রে। অনেক দিন পর্যন্ত একটি উচ্চ পদ খালি ছিল কোন্ জাতের লোককে নিয়োগ করা হবে তা নিয়ে মতভেদ ছিল বলে। তা হলে দেখা যাচ্ছে শিক্ষিতদের মনে স্বাধীনতার রং ধরেনি। নিরক্ষরদের মনে তো নয়ই। মুসলমানের উপর রাগ করে হিন্দু জাতি বলে একটা কিছু ক্রমশ দানা বাঁধছে। হিন্দু জাতীয়তার কথা ঘন ঘন শোনা যাচ্ছে। কিন্তু ভারতীয় জাতীয়তা আমাদের জীবনে সত্য হয়ে উঠতে পারছে না। ভারতীয় জাতীয়তা দূরের কথা, বাঙালী জাতীয়তাও ধোপে টিকছে কই ?

প্রত্যয়

বাঙালী জাতি বলে যদি কোনো জাতি থাকে তবে মুসলমান তার অবিচ্ছেদ্য অংশ। মুসলমানকে তার থেকে কিছুতেই বাদ দেওয়া যায় না, দিলে বাঙালী জাতি বলে কিছু থাকে না, থাকে হিন্দু জাতি। অথচ লীগপন্থীদের মতো কংগ্রেসপন্থীদের কেউ কেউ বলতে আরম্ভ করেছেন যে লোকবিনিময়ের দ্বারা পশ্চিমবঙ্গ থেকে মুসলমানদের বাদ দিতে হবে, পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দুদের বাদ দিতে হবে। সমাজতন্ত্রীদের কেউ কেউ সমর্থন করছেন এ প্রস্তাব। প্রতিদিন খবরের কাগজ খুললে চোখে পড়ে লোক বিনিময় আপনা আপনি হয়ে যাচ্ছে। এ যে কিছুদিন পরে বন্ধ হবে তার লক্ষণ নেই। এর ফলে বাঙালী জাতি বলতে বোঝাবে হিন্দু জাতি। মুসলমানদের নিয়ে গড়ে উঠবে পাকিস্থানী জাতি। জিন্না সাহেবের দ্বিজাতিতত্ত্বই জয়ী হবে। গান্ধীজীর একজাতিতত্ত্ব ও তার জন্যে তাঁর জীবনবলি ব্যর্থ হবে। ব্যর্থ হবে শচীন্দ্রের প্রাণদান, স্মৃতীশের প্রাণদান।

এসব দেখেশুনে আমার মনে হয়, আমাদের দেশপ্রেম খাঁটি ছিল বলে দেশ স্বাধীন হলো, কিন্তু আমাদের জাতিপ্রেমে খাদ ছিল, তাই দেশ খণ্ডিত হলো। খাদ যতদিন থাকবে খণ্ডন ততদিন থাকবে। বাহুবল দিয়ে এর সংশোধন হবে না। বাহুবলের দ্বারা দেশকে এক করতে পারা যায়, কিন্তু জাতিকে এক করা সম্ভব নয়। তার জন্যে চাই প্রেম। যেখানে প্রেম নেই সেখানে একজাতি নেই, থাকতে পারে এক দেশ, কিন্তু তার স্বাধীনতা বেশি দিন স্থায়ী হয় না। আমরা দেশপ্রেমের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি, কিন্তু সামনে রয়েছে আর একটা পরীক্ষা। সেটা জাতিপ্রেমের। তাতে যদি ফেল করি তা হলে আমাদের স্বাধীনতা

বিপন্ন। হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা এর তাৎপর্য বুঝবেন না। কিন্তু ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরাও যদি সমান অবুঝ হন তা হলে স্বাধীনতার আয়ুষ্কাল আঙুলে গুনে বলা যায়।

এমন দেশ নেই যে দেশের ইতিহাসে গৃহযুদ্ধ বা গৃহবিবাদ ঘটেনি; ইংলণ্ডে ঘটেছে, আমেরিকায় ঘটেছে, ফ্রান্সে, জার্মানীতে, রাশিয়ায় ঘটেছে, এই সেদিন চীনে ঘটল, এইমাত্র কোরিয়ায় ঘটছে। তা বলে কেউ কি কোনো দিন লোকবিনিময়ের কথা মুখে এনেছে? এ কথা যারা ভাবতে পারে তারা স্বাধীনতার ধার ধারে না। পুরুষানুক্রমে পরাধীন না হলে এমন অমঙ্গলের কথা কেউ মুখে ধরে না। এটা সেই দাসমনোভাব যে স্বাধীনতার পরেও কাজ করছে। ভারত ও পাকিস্থান একই দেশের দুই স্বতন্ত্র খণ্ড। এরা যদি যুদ্ধ করে তা হলে সেটা হবে গৃহযুদ্ধ। এত দিন যা করে এসেছে তা গৃহবিবাদ। এর দরুন লোকবিনিময়ের প্রস্তাব তোলা ইতিহাসে অপূর্ব। যে পথ দিয়ে লোকজন চলে যাচ্ছে সেই পথ দিয়ে ভারতীয়তাও চলে যাচ্ছে। এটুকু বোঝবার মতো সূক্ষ্ম বুদ্ধিও যদি না থাকে তবে ভাবনার কথা বৈকি। তাদের বদলে যেসব লোকজন চলে আসছে তারা এলে আমরা ভারতীয় হব না, হব হিন্দু। সেভাবে যদি স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব হতো তা হলে ভারতীয় জাতীয় মহাসভার উৎপত্তি হতো না, হিন্দু মহাসভাই দেশকে স্বাধীন করত। সে ভাবে স্বাধীনতা সংরক্ষণ করাও সম্ভব নয়।

আমরা হিন্দু জাতীয়তাবাদী হব না ভারতীয় জাতীয়তাবাদী হব এ বিষয়ে অবিলম্বে মনঃস্থির করতে হবে। যদি ভারতীয় জাতীয়তাবাদী

হব বলে স্থির করি তা হলে তৎক্ষণাৎ লোকবিনিময় বন্ধ করতে হবে। এ খেলা বেশী দিন চলতে পারে না, কারণ এর দরুণ আমরা স্বাধীনতার অযোগ্য হয়ে পড়ছি। আমরা যদি এক জাতি হয়ে থাকি তা হলে লোকবিনিময়ের প্রশ্ন উঠতেই পারে না। আর যদি দুই জাতি হয়ে থাকি তা হলে দেশ বিভাগ তার অনিবার্য পরিণাম, লোকবিনিময় তার পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদ, যুদ্ধবিগ্রহে তার পরিসমাপ্তি, তার উপসংহার স্বাধীনতা বিসর্জন। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমীর পর বিজয়া দশমী। আমরা একজাতি না দুই জাতি এইটেই আসল প্রশ্ন।

(১৯৫০)

চিড়িয়াখানা

দাদা বললেন, "ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি ভারতবর্ষ নাকি মস্ত বড় একটা সমস্যার সমাধান করতে পেরেছে, আর কোনো দেশ যা পারেনি। নানা বিচিত্র বেশভূষা, নানা বিচিত্র প্রথা, নানা বিচিত্র জাতি, ধর্ম, ভাষা। ভারতের সাধনা হচ্ছে এই বৈচিত্র্যকে স্বীকার করে নিয়ে সমন্বয়ের দ্বারা ঐক্যবদ্ধ করা। এই সাধনায় ভারত সিদ্ধিলাভ করেছে। শুধু ইংরেজের চক্রান্তে তার শান্তিভঙ্গ হচ্ছে। ইংরেজকে তাড়িয়ে দাও। দেখবে দাঙ্গা-হাঙ্গামা নেই। থাকবে কী করে? ভারত যে সমন্বয়ের দেশ! এখন দেখছি সমাধান যে করেছিল সে ভারত নয়, সে ভারতের ব্রিটিশ সরকার। যা দিয়ে করেছিল তা সমন্বয়ের আদর্শ নয়, তা নাঙ্গা তলোয়ার। ব্রিটিশ বেয়োনেট সরে গেছে, তাই দাঙ্গা-হাঙ্গামা পাঞ্জাবকে বিধ্বস্ত করেছে, বাংলাকে করছে। ইংরেজ আমলে যা ঘটেছিল সে আর কতটুকু! তারা যেতে না যেতে যা ঘটল তা ইতিহাসে অপূর্ব। কেবল ভারতের ইতিহাসে নয়, পৃথিবীর ইতিহাসে। পাঞ্জাবের হিন্দু-মুসলমান-শিখ দুনিয়ার রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। শুধু নরহত্যায় নয়, নারীধর্ষণে, গৃহদাহে, লুণ্ঠনে। আমরা বাঙালী হিন্দু-মুসলমান যোদ্ধা জাতি নই বলে ওদের রেকর্ড ভাঙতে পারি নি, তা হলেও যা করেছি তা বাংলাদেশের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। আমাদের আফসোস এই যে,

ফস্ করে একটা চুক্তি করে দিল্লী ও করাচীর দুই সরকার আমাদের দুই হাত ধরে টেনে সরিয়ে দিয়েছে। দুই জানোয়ারকে যেমন খাঁচায় পুরে তাদের রক্ষকরা পাহারা দেয় তেমনি করে পাহারা দিচ্ছে জবহরলাল ও লিয়াকৎ আলি। চিড়িয়াখানার শান্তি ও শৃঙ্খলা যেমন উপর থেকে চাপানো, লোহার খাঁচার ভিতর পুরে তালা বন্ধ করে বাইরে গুলীভরা বন্দুক হাতে টহল দিয়ে আগলানো—আমাদের শান্তি ও শৃঙ্খলাও তেমনি। প্রহরী যদি একটু অসতর্ক হয় তা হলে প্রলয়কাণ্ড বেধে যাবে। চিড়িয়াখানার বাঘ, সিংহ, কুমীর, অজগর মিলে আর সবাইকে নিয়ে মোচ্ছব শুরু করে দেবে। এই আমাদের বাংলা দেশ। এ-দেশের হিন্দু-মুসলমান এক দিন ক্লাইভের সঙ্গে লড়েছিল। এই দেশের ছেলে সুভাষ হিন্দু-মুসলমানে৷ আজাদ হিন্দ্ ফৌজ নিয়ে ইংরেজকে আক্রমণ করেছিল। বিশ্বাস হয় তোমাদের?"

আমরা নিঃশব্দে শুনেছিলুম। বলবার ছিল অনেক কথা, প্রতিবাদ করবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু দাদা আর কাউকে বলতে দেবার পাত্র নন। নিজেই বলে চললেন আবার, "এখন এই তো অবস্থা। আগে একটা আশাভরসা ছিল। ইংরেজ রাজার হোক বিদেশী। সে চিরদিন থাকবে না। কিন্তু এরা আমাদের স্বদেশী শাসক। এদের বলতে পারিনে যে, চলে যাও। থাকো, একথাও বলতে পারছি কই? দোটানায় পড়েছি।"

দাদা বিমর্ষভাবে মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। তখন সুরজিৎ বললেন, "দাদা, সত্যি করে বলুন দেখি, আপনি কী চান? কী হলে খুশি হন?"

"শান্তি। আমার প্রাণ চায় শান্তি। আমার চোখের সামনে

আমার দেশ ছারখার হয়ে যাচ্ছে, আমার জাতি আত্মহত্যা করছে, দেখছি আর দেখে কিং-কর্তব্য-বিমূঢ় হচ্ছি। তা বলে চাপানো শান্তি চাইনে। বেয়োনেটের শান্তি, কবরের শান্তি যথেষ্ট হয়েছে। তেমন শান্তির উপর ঘেন্না ধরে গেছে। তার চেয়ে যুদ্ধ ভালো। আমি চাই সমন্বয়ের শান্তি, সামঞ্জস্যের শান্তি, আন্তরিক শান্তি, স্বতঃস্ফূর্ত শান্তি। যে শান্তি বাইরের প্ররোচনায় ভাঙবে না, পরের চক্রান্তে টুটবে না।"

সুরজিৎ বললেন, "দাদা, সাতশো বছর ওদের সঙ্গে আমরা বাস করছি। বলতে পারেন কবে ওরা আমাদের শান্তিতে থাকতে দিয়েছে? মোগল যুগেও ছিল চাপানো শান্তি কবরের শান্তি। ব্রিটিশ যুগেও তাই। স্বাধীনতার পরে যা দেখছি তা নতুন কিছু নয়। নতুন বলতে এই পর্যন্ত যে, আমাদের হাতে একটা সৈন্যদল এসেছে। ছোট ছেলের হাতে ছুরি পড়লে যা হয়। সব জিনিস ছুরি দিয়ে কাটে। আমরাও সব জিনিস সৈন্য দিয়ে সমাধান করতে চাই। ট্রাম-বাস পোড়াচ্ছে, পাঠাও সৈন্য। রেল লাইন সরিয়েছে, পাঠাও সৈন্য, ঘরবাড়ী ভেসে গেছে, পাঠাও সৈন্য। ফসল কাটবার লোক নেই, পাঠাও সৈন্য। এর পরে নির্বাচনের সময় সৈন্য পাঠাতে হবে। হিন্দু-মুসলমান সমস্যাও সৈন্যরাই মেটাবে, আমাদের গায়ে আঁচড়টি লাগবে না। বাধাও যুদ্ধ।"

জয়ন্ত চুপচাপ বসে সিগারেট টানছিলেন। অবশ্য দাদার অনুমতি নিয়ে। বললেন, "যুদ্ধের প্রয়োজন থাকলে যুদ্ধ বাধবেই। রাজারা যুদ্ধের দায়িত্ব না নিলে প্রজারা নেবে। আপনি কি বলতে চান যুদ্ধের প্রয়োজন নেই?"

সুরজিৎ বললেন, "আছে বৈকি। তবে সাতশো বছর যখন সহ্য করেছি তখন আরো কয়েক বছর সবুর করে দেখি। ধৈর্য আমাদের অসাধারণ। নইলে পাঁচশো বছর কেউ মুসলমানের অধীনে, দু'শো বছর কেউ ইংরেজের অধীনে কাটায়?"

দাদা বললেন, "কিন্তু আমার আসল কথা তা নয়। আমি যা চাই তা শান্তি, সত্যিকারের শান্তি। যুদ্ধের পথ দিয়ে কেউ কি কখনো শান্তির কুটীরে পৌঁছেছে? যাকে ওরা শান্তি বলে সেটা সাময়িক যুদ্ধবিরতি। তেমন শান্তি আমি চাইনে। তার চেয়ে যুদ্ধ ভালো। যা হবার তা হয়ে যাক, চুকে যাক। খতম হোক, সাবাড় হোক।"

নেপালদা সায় দিয়ে বললেন, "আমিও তাই বলি। হয় হিন্দু সাবাড় হয়ে যাক, নয় মুসলমান সাবাড় হোক। সেইজন্যে বলি এখান থেকে মুসলমানদের ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দাও। ওখান থেকে হিন্দুদের নিংড়ে বের করে নিয়ে এসো। ওদুটো জাত একসঙ্গে থাকতে পারবে না। লোকবিনিময় হচ্ছে একমাত্র সমাধান। তাতে যুদ্ধের ঝামেলা নেই। কারো গায়ে আঁচড়টি লাগবে না। তারপরে শান্তি, চিরস্থায়ী শান্তি। যে যার নিজের ঘরে আরামে বাস করবে। এখানে হিন্দু, ওখানে মুসলমান।"

দাদা বললেন, "সেও তো সমস্যাকে ফাঁকি দেওয়া। তাতে সমন্বয়ের স্বাদ নেই। অতএব সত্যিকারের শান্তি নেই। একদিন ওদের শক্তি বৃদ্ধি হলে ওরা এসে আমাদের ঘরে হানা দেবে। আমাদের শক্তি বৃদ্ধি হলে আমরাও ওদের ঘরে চড়াও হব। তৃতীয় পক্ষ কোন দিক থেকে

ছুটে আসবে গরুড়ের মতো। গজকচ্ছপ দুটোকেই গ্রাস করবে পরম আনন্দে।"

সুরজিৎ বললেন, "তা ছাড়া লোকবিনিময় তো মুখের কথায় হবে না। তার জন্যে অনিচ্ছুকের উপর চাপ দেওয়া দরকার। চাপ দিতে গেলে মারামারি বেধে যাবে। কে তার দায়িত্ব নেবে?"

ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে জয়ন্ত বললেন, "কেউ যদি না নেয়, জনতা নেবে।"

"তার মানে অরাজকতা।" সুরজিৎ বললেন, "কোনো রাষ্ট্রই তা বরদাস্ত করতে পারে না। তা যদি চাও তো আগে রাষ্ট্র ভেঙে দাও। যে ডালে বসেছ সেই ডাল কাটো।"

নেপালদা বললেন, "ওটা কোনো কাজের কথা নয়। আমরা রাষ্ট্র ভাঙতে চাইনে, নিরাপদ হতে চাই। কী ক'রে তা হবে, যদি লোক-বিনিময় না হয়?"

"লোকবিনিময় যদি আপনা আপনি হয় আমার আপত্তি নেই কিন্তু চাপ দিতে গেলে মারামারি বাধবে। রাষ্ট্র বরদাস্ত করবে না।" সুরজিৎ বললেন।

"লোক বিনিময় যদি আপনা আপনি হয়," দাদা বললেন, "তা হলেও আমার আপত্তি। ওটা সমস্যার সমাধান নয়, সমস্যার থেকে পলায়ন। ওতে সমন্বয়ের স্বাদ নেই! বরং আরো দশ রকম ফ্যাসাদ। পূর্ববঙ্গের অর্ধেক হিন্দু যদি চলে আসে বাকী অর্ধেক আরো দুর্বল হয়ে পড়বে। পশ্চিমবঙ্গের অর্ধেক মুসলমান যদি চলে যায়, বাকী অর্ধেক আমাদের

উপর আস্থা রেখে নিশ্চিন্ত হতে পারবে না। সংখ্যালঘুকে বিলুপ্ত করে বা উদ্বিগ্ন করে কি সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান হয়? ও পথে শান্তি নেই সম্ভাব নেই। অন্য পন্থা চাই।"

জয়ন্ত বললেন "দাদা, আপনি দেখছি শান্তির কাঙাল। ওটা আপনার বয়সের লক্ষণ। আমি কিন্তু অশান্তিকে ভয় করিনে, আমার কাছে শান্তির কোনো দাম নেই, যা কিছু দাম আত্মরক্ষার। বাঙালীকে বাঙালী না রাখলে কে রাখবে?"

দাদা বললেন, "কেন, ওরাও কি বাঙালী নয়? বাঙালী বলতে কি শুধু হিন্দু বোঝায়? মুসলমান বোঝায় না? ক্রিশ্চিয়ান বোঝায় না?"

"বোঝায় বৈকি। কিন্তু দেখছেন না ওরা পূর্ববঙ্গের নাম রেখেছে পূর্বপাকিস্তান। ওরা এককালে বাঙালী ছিল। এখন পূর্ব পাকিস্তানী।"

"হাঁ, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে যারা বাস করে সে সব মুসলমান তো বাঙালী। না তাদেরও তুমি পূর্ব পাকিস্তানী বলতে চাও?"

"ওরা তো পাকিস্তানে যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে রয়েছে। সামান্য একটু ঠেলা দিলেই দৌড় দেবে। ওরা বর্ণচোরা আম। প্রচ্ছন্ন পাকিস্তানী।"

দাদা বললেন, "তা হলে বাঙালীর সংখ্যা কমিয়ে এনে তুমি আড়াই কোটিতে দাঁড় করালে। বাকী তিন কোটি বাঙালীকে বানালে অবাঙালী। পূর্বপুরুষের বর্জনশীল মনোভাব একদা হিন্দু থেকে

মুসলমান সৃষ্টি করেছিল। আজ বাঙালী থেকে অবাঙালী সৃষ্টি করছে সেই একই মনোভাব। বৃথা দোষ দিচ্ছ ওদের।”

নেপালদা বললেন, “ওরা তো বাংলা ভাষার অনেক কিছু বাদ দিচ্ছে, তার সঙ্গে অনেক কিছু জোড়া দিচ্ছে। ফলে যা হয়ে উঠেছে তা বাংলা কি আরবী বোঝা যায় না। বোধ হয় পূরবী উর্দু। দাদা, আপনি ওদের বাঙালী বলে গণ্য করলে কী হবে, ওদের গাঁটছড়া বাঁধা সিন্ধু প্রদেশের সঙ্গে।”

“সেটাও তো মহাভারতের অঙ্গ। ওরা যদি সিন্ধুর সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধে আর আমরা যদি ওদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধি, তা হলে মহাভারতেরই গ্রন্থি বন্ধন হয়। তার জন্যে দুঃখ করিনে। দুঃখ এই জন্যে যে, কেউ কাউকে বাঁচতে দেবে না, জ্বালিয়ে মারবে। অথচ এমন করে পরস্পরকে জ্বালাতন করার কী প্রয়োজন ছিল বলতে পারো? হিন্দু-মুসলমান উভয়ের পক্ষে কি দেশটা যথেষ্ট বৃহৎ, যথেষ্ট ধনসম্পন্ন নয়? আমরা কি পরস্পরকে অংশ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পারতুম না? তাড়িয়ে দেওয়ার মেরে ফেলার মতো দীনতা আমাদের হলো কবে ও হলো কেন?”

দাদা কখন এক সময় উঠে পায়চারি করতে শুরু করে দিলেন। তাঁর এতক্ষণ খেয়াল ছিল না, ঘরে আর এক জন মানুষ ছিল। হঠাৎ লক্ষ করে বললেন, “এই যে বিনু! তুমি কিছু বলছ না যে। তোমার কথাও শোনা যাক।”

বিনু বলল, “দাদা, আমি জীবনে কখনো এমন অসহায় বোধ করিনি। আমার দেশ নেই, দেশ ভেঙে গেছে। আমার জাতি নেই,

জাতি ভেঙে যাচ্ছে। আমার ভাষা নেই, ভাষায় ভাঙন ধরেছে আমার সাহিত্য নেই, সাহিত্যেও ভেদবুদ্ধি। থাকার মধ্যে আছে ধর্ম। সে ধর্মও নিত্য অধর্মের ভাগী হচ্ছে। আমার ধারণা ছিল আবার পূর্ব-পশ্চিমের মিলন ঘটবে। সে ধারণা অন্তত দশ বছর পেছিয়ে গেল সম্প্রতি যে-সব ঘটনা ঘটেছে তার দরুন। পাকিস্তান কেবল ওদের সৃষ্টি নয়, আমাদেরও সৃষ্টি। আমরাই তাকে আরো দশ বছর কায়েম করলুম। মূর্খের মতো ভাবছি লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান। সে ক্ষমতা আমাদের নেই। পাগলের মতো বকছি লোকবিনিময় চাই। এখানে এক কোটি আশ্রয়প্রার্থী, ওখানে এক কোটি আশ্রয়প্রার্থী ভিড় করলে কুবেরের ভাণ্ডার ক্ষয় হয়। আমাদের ভাণ্ডারে এমন কী আছে, ওদের ভাণ্ডারেই বা আছে কী, যে, দুকোটি লোকের জীবনধারণের সুব্যবস্থা হয়। মাঝখান থেকে নষ্ট হতে বসেছে চাষবাস, ব্যবসা-বাণিজ্য।"

নেপালদা বললেন, "সেটা গবর্নমেণ্টের ক্রটি। আসছে বারের নির্বাচনে আমরা সে ক্রটি সারাব।"

বিনু বলল, "কোনো গবর্নমেণ্ট পারবে না এ বোঝা বইতে। উটের পিঠে শেষ কুটোর মতো এ বোঝা এক দিন অর্থনীতির কাঠামো ভেঙে দেবে। বিপ্লবকে খাল কেটে ডেকে আনছে এ সমস্যা। এ নিয়ে যারা খেলা করছে তারা জানে না যে, তারা আগুন নিয়ে খেলা করছে।"

দাদা বললেন অভিভূত হয়ে, "কিন্তু উপায় কী আছে! সকলেই আমরা অসহায় হয়ে দেখছি দেশ চলেছে ভাসতে ভাসতে সর্বনাশের

মোহানায়। যেন একটা প্লাবনের মুখে পড়েছে। বিপ্লব আর কাকে বলে! এই তো বিপ্লব।"

জয়ন্ত বললেন, "আমি কিন্তু ভয় পাব না কিছুতেই। আসুক না বিপ্লব।"

নেপালদা শিউরে উঠলেন, "আমার দোকানের জন্যে মজবুত দেখে এক জোড়া তালা কিনতে হবে। কোন দিন কী হয় বলা যায় না "

"তা হলে চিড়িয়াখানার দ্বার খুলে যাবে দাদা?" সুরজিৎ প্রশ্ন করলেন।

"কে জানে ভাই। আমার মাথা খারাপ হবার যোগাড়। এমন স্বাধীনতা কে চেয়েছিল! কোথায় সুভাষ? বেঁচে থাকলে ওর আসা উচিত ছিল এখন।" দাদা বললেন, "ও যদি আসত তা হলে এ সমস্যা দু'দিনে মিটে যেত।"

"আমিও তাই ভাবি।' বললেন নেপালদা, "ওকেই ভোট দিতুম।"

বিনু বলল, "অত সহজে মিটত না, দাদা। সুভাষ এলেও মিটত না। যেসব নির্মম নিষ্ঠুর ব্যাপার সংঘটিত হয়েছে, তার জন্যে অনুতাপ করতে হবে দুই পক্ষের লোককে। যেখানে অনুতাপ নেই সেখানে আশাভরসা নেই। আপনি কি কোথাও এতটুকু অনুতাপের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছেন?"

"না, তার চিহ্ন নেই।"

"এর চেয়ে ঢের বেশী গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গেল ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী তারিখে। তার জন্যে আজপর্যন্ত কেউ অনুতাপ করল না!

আমাকে অবাক করেছে আমার দেশের এই নৃশংস মনোভাব। এ দেশ তো আমার চেনা দেশ নয়।"

"সেইজন্যেই তো বলছি চিড়িয়াখানা," দাদা আর্দ্র স্বরে বললেন।

বিনু বলল, "আমার লক্ষ্য আর কিছুর উপরে নয়। আমি আমার দেশের নাড়ীতে হাত রেখে বসে আছি। দেখছি সে অনুতাপ করছে কি না। অনুতাপ তাকে করতেই হবে যদি সে বাঁচতে চায়। কিন্তু কবে তা জানিনে। দুর্ভিক্ষ ভূমিকম্প প্লাবন এক এক করে সব রকম দুর্যোগ আসছে। কাঁদতে ইচ্ছা করছে, কিন্তু কার জন্যে কাঁদব! যে পাপ করেও পাপের জন্যে অনুতাপ করল না তার জন্যে কাঁদব! না, কাঁদব না। তাকে সাজা পেতে হবে।"

নেপালদা বললেন, "ওটা তোমার বাড়াবাড়ি। কে পাপ করেছে, কবে পাপ করেছে, তার জন্যে অনুতাপ করতে হবে দেশশুদ্ধ মানুষকে? নইলে সাজা?"

জয়ন্ত বললেন, "কিসের পাপ? আজকের জগতে পাপ বলে কিছু নেই। আণবিক বোমা ফেলে যারা লক্ষ লক্ষ নারী ও শিশু হত্যা করল তারাই এখন জাতিসংঘের মোড়ল। তাদের কাছে দরবার না করলে আমরা কাশ্মীর রাখতে পারব না। কোথায় তোমার পাপ? কার জন্যে অনুতাপ করব?"

বিনু কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে রইল। তার পর বলল, "দাদা, আজ উঠি।"

"উঠবে? আচ্ছা, আর এক দিন এসো। মতের সঙ্গে মত মেলে না,

তা হলেও দুটো কথা বলে প্রাণটা জুড়োয়।" দাদাও উঠলেন তাকে এগিয়ে দিতে। আত্মগতভাবে বললেন, "৩০শে জানুয়ারী আমরা আমাদের বিবেক বলি দিয়েছি। বিবেকহীন সমাধান তো সমাধান নয়। আগে বিবেক ফিরে পাই, তার পরে সমাধান খুঁজে পাব।'

বিনু বলল, "তথাস্তু।"

সুরজিৎ বললেন, "আমিও চলি। অন্তর অন্বেষণ করতে হবে। বাইরে তো কিছু দেখতে পাচ্ছিনে। দাদা, নমস্কার। নমস্কার, নেপালদা। জয়ন্ত, নমস্কার। চলো বিনু।"

(১৯৫০)

পনেরোই অগাস্ট

এবারকার স্বাধীনতা দিবসে তেমন কোনো উন্মাদনা দেখা গেল না ; উন্মাদনা দূরের কথা, সহজ আনন্দ সাধারণ আহ্লাদ তাও যেন অদৃশ্য হয়েছে। এই নিয়ে আলোচনা চলছিল চার বন্ধুতে।

পত্রনবীশ বলছিলেন, "আমেরিকা স্বাধীন হয় পৌনে দু'শো বছর আগে। সেদিনকার উন্মাদনা এতদিনে শুকিয়ে মরে যাবার কথা। কিন্তু প্রতি বছর চৌঠা জুলাই তারিখে দেখা যায় সে মাদকতা তেমনি সরস, তেমনি ফেনিল। একটা দিনের জন্যে সারা দেশ উদ্দাম হয়ে ওঠে। আমাদের যেমন হোলিখেলার দিন তাদের তেমনি স্বাধীনতার দিন। ফরাসীদের দেশে বিপ্লব আরম্ভ হয় দেড়শো বছর আগে। এখনো তার স্মৃতি তেমনি সবুজ। প্রতি বছর চৌদ্দই জুলাই তারিখে প্যারিসের রাস্তাঘাটে নাচ গান হল্লার অবধি থাকে না। তুমি যদি সেখানে যাও তোমাকে নিয়ে নাচবে ওদের তরুণীরা। আমাদের যেমন রাসলীলা তাদের তেমনি বিপ্লবের প্রথম দিবা।"

সিতাংশু বললেন, "সেই জন্যেই তো আমরা বিপ্লব চাই। রাসলীলা।"

পত্রনবীশ বললেন, "তার সঙ্গে তুলনা করো আমাদের পনেরোই অগাস্টের। তিন বছর যেতে না যেতে বানের জল নেমে গেছে। নদীর বুকে মস্ত চড়া। মরুভূমির মতো খাঁ খাঁ করছে দেশ। তিন বছর যদি বেঁচে থাকি হয়তো দেখব পনেরোই অগাস্ট লোকে শোকসভা করছে।"

বিমলেন্দু বললেন, "ওটা তোমার বাড়াবাড়ি। এটা একটা দুর্বৎসর বলেই কারো মনে উৎসাহ নেই। এমন দুর্বৎসর কি আমেরিকার ইতিহাসে দেখা যায়নি?"

পত্রনবীশ বললেন, "সে জন্যে নয়। লোকে ক্রমশ বুঝতে পারছে যে, স্বাধীনতা যতটুকু সত্য, অঙ্গহানি তার চেয়ে অনেক বেশী সত্য। দেশ স্বাধীন হয়েছে এর জন্যে তারা সুখী, কিন্তু দেশ অঙ্গহীন হয়েছে তার জন্যে তাদের অসুখের অন্ত নেই। যেন কারা একজনকে জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বারো বছর পরে। সে মুক্তির প্রথম দিনে আনন্দ করছে। কিন্তু যতই দিন যাবে ততই তার ব্যথাবোধ প্রবল হবে এইজন্যে যে বেচারার একখানা হাত কেটে রাখা হয়েছে।"

স্বয়ম্ভূ বললেন, "আমার মনে হয়, তা নয়। বিয়ের রাতের রোমাঞ্চ কি বিয়ের তিন বছর পরে কেউ আশা করে? তখন হয়তো দেখবে একঘেয়ে লাগছে। স্বাধীনতা দিবসে জোর করে আনন্দ করতে হবে. এটা প্রাণহীন একটা প্রথা। তার চেয়ে চুপ করে চিন্তা করা ভালো এই তিন বছর আমরা স্বাধীন মানুষের মতো ব্যবহার করেছি না উচ্ছৃঙ্খল বর্বরের মতো। লোকের স্বাধীনতা জিনিসটা বিনা সর্তে পাওয়া গেছে, বিনা সর্তে ভোগ দখল করা যাবে। সেটা ভুল। ওর একটা অলিখিত সর্ত আছে।*

"কী সে সর্ত?" প্রশ্ন করলেন পত্রনবীশ।

"সর্তটা হচ্ছে এই যে, সম্বৎসরে একটা দিন হৈ হুল্লোড় করতে পারো, কিন্তু বাকী তিনশো চৌষট্টি দিন শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হবে। যারা

বারো মাস উত্তেজনার নেশায় নাচছে তাদের দম থাকলে তো তারা পনেরোই অগাস্ট উৎসব করবে। এ রকম যদি চলতে থাকে তা হলে তিন বছর পরে শোকসভা করতে হবে হয়তো। করতে হবে স্বাধীনতা হারানোর জন্যে।"

"তা হলে তো আপদ যায়।" সিতাংশু বললেন, "এ আজাদী ঝুটা হৈ।"

"না, না। এতদূর আমি যাব না। এ আজাদী সাচ্চা," পত্রনবীশ বললেন। "কিন্তু এ অঙ্গহানি আমি সইতে পারছিনে। দিন দিন অসহনীয় হচ্ছে।"

"তোমার একার নয়, ভাই। আমাদের সকলের!" বিমলেন্দু বললেন।

"আমার ভাই যখন জাপান যায়," স্বয়ম্ভু বলতে লাগলেন, "তখন লক্ষ করে ডিসিপ্লিন জিনিসটা জাপানীদের মজ্জাগত। অথচ চীনাদের তা নয়। সেইজন্যে জাপানীরা সংখ্যাল্প হয়েও যুদ্ধে জিতছিল, চীনারা সংখ্যাধিক হয়েও হারছিল। আমাদের ইতিহাসেও এর বহুতর প্রমাণ আছে। মুষ্টিমেয় মুসলমান যে পাঁচশো বছর হিন্দুদের উপর প্রভুত্ব করতে পারল তার মূলে তাদের সহজাত ডিসিপ্লিন। ইংরেজদের তো আঙুলে গোনা যায়। দু'শো বছর তারা হিন্দু-মুসলমানের উপর রাজত্ব করে গেল। তার মূলেও সেই ডিসিপ্লিন। ইংরেজের ডিসিপ্লিন মুসলমানকেও লজ্জা দেয়। হিন্দুকে তো দেয়ই।"

পত্রনবীশ কী বলতে যাচ্ছিলেন, বিমলেন্দু বললেন, "আঃ। বলতে দাও।"

"আমরা যে অবশেষে স্বাধীন হয়েছি এও সেই ডিসিপ্লিনের পুণ্য-বলে।" বলে চললেন স্বয়ম্ভূ। "মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে যখন আটটি প্রাদেশিক গবর্নমেণ্টের মধুচক্র থেকে স্বেচ্ছায় সরে দাঁড়ায় কংগ্রেস, তখন বড়লাট লিনলিথগো ভেবেছিলেন মৌমাছি ক'দিন চাক ছেড়ে থাকবে। আইন-সভার সদস্যদের মাইনে বন্ধ করে দিয়ে মনে করলেন এবার তো ফিরে যেতেই হবে। কিন্তু এক বছর গেল, দু'বছর গেল, আড়াই বছর গত হতে চলল। সবাই তখন জেলে। ক্রিপস্ এলেন দৌত্য করতে। জেলখানার দ্বার খুলে গেল। কিন্তু মধুচক্রে ফিরে গেল না কংগ্রেস। ফিরে গেল জেলখানায়, তার আগে জ্বালিয়ে গেল দাবানল। কোটি কোটি টাকার প্রলোভন স্বেচ্ছায় উপেক্ষা করল। কেটে গেল আরো তিন-চার বছর। কোন দেশের ইতিহাসে কোন পার্টি ক্ষমতা হাতে পেয়েও মেজরিটি থাকা সত্ত্বেও ক্ষমতা বিসর্জন দিয়ে সাত বছর অজ্ঞাত-বাস বরণ করেছে?"

"সে কংগ্রেস আর নেই।" আক্ষেপ করলেন বিমলেন্দু। "সে ডিসিপ্লিন আর নেই। সে ত্যাগস্পৃহা আর নেই। যে দীপ নিবে গেছে সে আর জ্বলবে না।"

"তার জন্যে আফসোস করে কী হবে!" স্বয়ম্ভূ বললেন, "ডিসিপ্লিন যদি আমাদের জাতীয় চরিত্রের অঙ্গ হয়ে থাকে তা হলে একদিন কংগ্রেসকে দিয়ে যার প্রমাণ দেওয়া হয়েছে, তেমনি আর কাউকে দিয়ে

তার প্রমাণ দেওয়া যাবে। নদীর জল চিরদিন একই খাতে প্রবাহিত হয় না। খাতের জন্যে দুঃখ করব না। দুঃখ করব নদীর জন্যে, যদি দেখি প্লাবনের আতিশয্যে প্রবাহ শুকিয়ে এসেছে।"

"তাই কি!" আত্মগতভাবে অস্ফুট স্বরে বললেন বিমলেন্দু।

"আমার ভয় হয়, তাই। উচ্ছৃঙ্খলতাকে কঠোর হস্তে দমন না করলে আমাদের স্বাধীনতার পরমায়ু বেশী দিন নয়। পাকিস্তানের কী আসে যায়? স্বাধীনতার জন্যে সে তো ষাট বছর ধরে সাধনা করেনি। তার সঙ্গে উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতিযোগিতায় নেমে আমরা যদি আমাদের স্বাধীনতা হারাই আর সেও যদি হারায় তার স্বাধীনতা তা হলে আমাদের ষাট বছরের সাধনা ব্যর্থ। তার তেমন কোনো ব্যর্থতা নেই।"

এ কথা শুনে সকলেই কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। তার পরে পত্রনবীশ ধীরে ধীরে মুখ খুললেন! "তুমি কি বলতে চাও আমাদের এ স্বাধীনতা পাকা নয়?"

"না, পাকা নয়। পাকা হবে যদি একে আমরা সংযমের বাঁধন দিয়ে বেঁধে রাখতে পারি। কিন্তু লক্ষণ ভালো নয়। পাকিস্থানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এক দল লোক চরম উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় দিয়েছে, অথচ তাদের নিন্দা করার মতো সৎসাহস আমাদের কারুর নেই। দেখে শুনে মনে হয়, আমরা রাজধর্ম পালন করার অযোগ্য। রাজা হবার সখ ষোলো আনা, অথচ অপ্রিয় হবার ভয়ও আঠারো আনা। যেই মুখ ফুটে কিছু বলতে যাই অমনি পাঁচজনে তেড়ে আসে। বলে, পাকিস্তানের পাল্টা দিতে হবে। তা যদি আমরা না করি, তবে আমরা রাজ্য রাখতে

পারব না। আমরা ক্লীব। এখন এই অমানুষদের সঙ্গে তর্ক করব কী? এরা যে এদের স্বাধীনতা আজ থেকেই হারিয়ে বসে আছে। ঘটনা দু'দশ বছর পরে ঘটে, তার কারণ ঘটে দু'দশ বছর আগে। এদের চেহারা দেখে আমি বুঝতে পারি এরা স্বাধীনতার চেয়ে মূল্যবান মনে করে প্রতিহিংসাকে। কেউ আপত্তি করলে বলে ক্লীব।"

পত্রনবীশ বললেন, "পাকিস্তানের সঙ্গে পাল্লা দিতে কেউ কি চায়? তবে সহ্য করারও একটা সীমা আছে। কিছু যদি না করি তা হলে ঘটনার স্রোত আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে।"

স্বয়ম্ভু বললেন, "যারা তাকে আয়ত্তের বাইরে চলে যেতে দেয় তারা এমন একটা শক্তিকে ডেকে আনে যে শক্তি তাকে আয়ত্তের মধ্যে ফিরিয়ে আনতে পারে। ইংরেজ বা মার্কিন বা আর কেউ একদিন এসে হাজির হবে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করতে। মাঝখান থেকে কাটা পড়বে স্বাধীনতা। বৃথা হবে ষাট বছরের সাধনা।"

সিতাংশু বললেন, "তখন বিপ্লব ঘটবে।"

"পাগল!" স্বয়ম্ভু অস্থির হয়ে বললেন। "বিপ্লবের ডিসিপ্লিন এর চেয়েও কঠিন। বিপ্লবী শাসনতন্ত্র কোনো রকম উচ্ছৃঙ্খলতা এক দিনের জন্যেও বরদাস্ত করে না। সে তার সমস্ত শক্তি সংহত করে প্রতিবিপ্লবের সঙ্গে শেষ বার কুস্তি লড়তে। তুমি কি মনে করো কমিউনিস্টদের হাতে শাসনভার পড়লে তারা হিন্দু-মুসলমানের হিংসা-প্রতিহিংসা চব্বিশ ঘণ্টা চলতে দেবে? কখনো না।"

আলোচনা যে লাইনে চলছিল সেটা বিমলেন্দুর পছন্দ হচ্ছিল না।

তিনি বার বার ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিলেন। বিনুর আসার কথা ছিল। ততক্ষণ আসর জমানোর জন্যে তিনি বললেন, "হাঁ, ডিসিপ্লিন বড় ভালো জিনিস। পার্টাপার্টির প্রশ্ন তুলে যারা ডিসিপ্লিন ভঙ্গ করতে উৎসাহ দেয় তারা স্বাধীনতার সর্ত ভঙ্গ করে। আমি কিন্তু ভাবছিলুম অন্য কথা। যেখানে যাই সেখানে দেখি সকলের মুখ অন্ধকার। যার সঙ্গে কথা হয় সেই বলে, কোথাও কিছু একটা বিগড়েছে। এই যে এতক্ষণ ডিসিপ্লিন সম্বন্ধে লেকচার শোনা গেল এও সেই বিগড়ানোর খবর। কিন্তু সারা ভারতের সর্বত্র হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটেনি। তবে কেন সারা ভারতের সর্বত্র অনিশ্চিত ভবিষ্যতের অন্ধকার ছায়া? তাই বলছিলুম এটা দুর্বৎসর। আমাদের গ্রহের দোষ।"

এমন সময় বিনু এসে পড়ল। বিমলেন্দু তাকে অভ্যর্থনা করে বললেন, "প্রকৃতি দেবীও আমাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছেন। অন্যে পরে কা কথা!"

এই নিয়ে কিছুক্ষণ তর্ক-বিতর্কের পর বিমলেন্দু বললেন, "তোমরা তো যার যা বলবার তা বলেছ। এখন বিনুর বক্তব্য শোনা যাক। এবারকার স্বাধীনতা দিবসে তেমন কোনো উন্মাদনা দেখা গেল না কেন, বলতে পারো, বিনু?"

বিনু বলল, "এ প্রশ্ন এই প্রথম শুনছিনে। যেখানে যাই সেখানে শুনি ওই একই জিজ্ঞাসা।"

"এখন তোমার কী উত্তর?"

"আমার উত্তর", বিনু বলল, "তোমাদের অজানা নয়। কত বার

ও কথা বলব ? ত্রিশ বছরের তপস্যার শেষভাগে তাপস যখন সিদ্ধির দোরগোড়ায় এসে পৌঁছেছে তখন যদি সিদ্ধির বদলে অপসিদ্ধি ঘটে তা হলে যা হয় আমাদের বেলা তাই হয়েছে। ক্লাইমাক্সের (climax) বদলে য়্যান্টি-ক্লাইমাক্স্ (anti-climax)। দেশ স্বাধীন হয়েছে কেউ অস্বীকার করবে না। যদি করে তো সেটা অভিমানের কথা। কিন্তু এর জন্যে গান্ধীর মতো নেতার ত্রিশ বছরব্যাপী নেতৃত্বের প্রয়োজন ছিল না। স্বাধীনতার সংগ্রামে যদি আর কেউ সেনাপতি হয়ে থাকতেন তা হলে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের কোনো অসঙ্গতি ঘটত না। আমাদের প্রতিবেশী বর্মা সিংহল পাকিস্তান স্বাধীন হয়েছে, ইন্দোনেশিয়া স্বাধীন হয়েছে, তাদের অতীতের সঙ্গে বর্তমানের এমন অসঙ্গতি ঘটেনি। কেবল আমাদের বেলায় এ অসঙ্গতি। না, অসঙ্গতি বললে কম বলা হয়। অতীত ও বর্তমানের মাঝখানে একটা ছেদরেখা পড়েছে। তাল কেটে গেছে। সুতো ছিঁড়ে গেছে। খেই হারিয়ে গেছে।”

বিনু আরো কয়েক রকম উপমা খুঁজছিল। বিমলেন্দু বললেন, “বুঝেছি।”

“বুঝলে তো। ব্যক্তির জীবনে এ রকম কিছু ঘটলে তার অসুখ করে। মানসিক অসুখ থেকে কায়িক অসুখ। ত্রিশ বছর এক ভাবে চলছে, তার পরে হঠাৎ আরেক রকম। তাও বাইরের চাপে নয়। অবস্থা বিপর্যয়ে নয়। নিজের ভিতরে যে কামনা ছিল, যাকে এতদিন দাবিয়ে রাখা হয়েছিল, সে এখন অশাসিত অবারিত। হঠাৎ মেনকার মুখ দেখে বিশ্বামিত্রের মনে যে ভাব এসেছিল সেটা বিশ্বামিত্রের ভিতরে

সুপ্ত ছিল। বিশ্বামিত্র স্বয়ং তা জানতেন না। জানতেন দেবরাজ ইন্দ্র। এ ক্ষেত্রে ব্যবসাদার ইংরেজ। তারা স্বাধীনতা দিয়েছে, কিন্তু যে স্বাধীনতার জন্যে তপস্যা চলছিল এ সে স্বাধীনতা নয়, সে স্বাধীনতাকে ইংরেজ ভয় করে বলেই এ স্বাধীনতাকে পাঠিয়েছে। এ স্বাধীনতা আমাদের লোভ দেখিয়েছে, লোভে পড়ে আমরা ভ্রষ্ট হয়েছি। যার জন্যে এতকাল তপস্যা করে এসেছি সে যে কোথায় মিলিয়ে গেছে তার পাত্তা নেই। আর যে তার সাক্ষাৎ পাব সে ভরসাও নেই। কে তার জন্যে আরো ত্রিশ বছর তপস্যা করবে? যিনি করতেন তিনি নিহত হয়েছেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে খাঁটি আছেন যে দু'চারজন তাঁদের কাজ হবে নিজেদের বিশ্বাস বাঁচিয়ে রাখা। কঠিন কাজ। বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে পথ চলতে হবে। সাথীর উপর নির্ভর করলে হতাশ হতে হবে। দল গঠন করে কাজ নেই। বিশ্বাস গঠন করো।"

বিমলেন্দু বললেন, "বিনু, সকলেই আমরা ত্যাগের শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছি। গান্ধীবাদীরাও বাদ যান না। গান্ধীজী যেদিন শহীদ হলেন সেই দিনই একটা যুগ শেষ হয়ে গেল। সেটা ত্যাগের যুগ। তারপর থেকে ত্যাগের আর কোনো নতুন দৃষ্টান্ত নেই, মহত্তর দৃষ্টান্ত নেই। যে আবহাওয়ায় আমরা বাস করছি সেটা ত্যাগের নয়, দলাদলির। গান্ধীবাদীরা দলাদলি থেকে সরে থাকতে চান, উত্তম। কিন্তু নতুন কোনো ত্যাগের দৃষ্টান্ত না দেখলে লোকে তাঁদের দিকে তাকাবে কেন? শুধু তাঁদের বিশ্বাসের একনিষ্ঠতা দেখে ক'জন আকৃষ্ট হবে?"

বিনু বলল, "আপাতত কাউকে আকর্ষণ না করাই ভালো। নীরবে

নিজের কাজ করে যাওয়াই যথেষ্ট। ত্যাগের অনেক রকম অভিব্যক্তি আছে। কেউ যদি পরের জন্যে আর কিছু না করে, কেবল সূতো কাটে, সেও এক হিসাবে ত্যাগ করে। কেউ যদি পরের জন্যে হাল লাঙল ধরে চাষ করে, সেও এক হিসাবে ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখায়। দেশে এখনো সেবাকর্মীর অভাব হয়নি, তাদের সংখ্যা আগের চেয়ে কম হলেও খুব কম নয়। অভাব ঘটেছে বজ্রকঠোর বিশ্বাসের। বিশ্বাস যাদের আছে তাদেরও বিশ্বাসের জোর তেমন নেই। সেইজন্যে আমি ত্যাগের চেয়ে বিশ্বাসের উপর ঝোঁক দিতে চাই।"

সিতাংশু বললেন, "বিনু, তুমি কি মনে করো গান্ধীবাদের কোনো ভবিষ্যৎ আছে? আমার তা মনে হয় না। বিশ্বাস এ ক্ষেত্রে অন্ধ-বিশ্বাস।"

বিনু বলল, "মার্ক্সের মৃত্যুর পরে প্রায় পঞ্চাশ বছর কাটল, তার পরে এলো রুশ বিপ্লব। সেই পঞ্চাশ বছর মার্ক্সবাদীদের কেউ ধর্তব্যের মধ্যে আনেনি। তাঁদের অনেকেই মার্ক্সের উপর খোদকারী করে নিজেদের পায়ে নিজেরাই কুড়ুল মেরেছিলেন। ভবিষ্যৎ নেই তাঁদেরই যাঁরা গান্ধীর উপর খোদকারী করছেন।"

সিতাংশু বললেন, "দেশ কি তা বলে পঞ্চাশ বছর অপেক্ষা করবে?"

বিনু বলল, "ব্যক্তির জীবনে পঞ্চাশ বছর খুব বেশী দিন। কিন্তু জাতির জীবনে এমন কী বেশী! দেখতে দেখতে কেটে যাবে। ইতিমধ্যে বিশ্বামিত্রের দল কী করতে চান করুন। অন্যান্য দলেরও কেরামত দেখা যাক। গান্ধীবাদীদের ডাক পড়বে সকলের শেষে। ততদিন

তাঁদের ধৈর্য ধরতে হবে। সংখ্যায় কিছু আসে যায় না। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে গান্ধীজী যেদিন আসেন সেদিন তিনি ছিলেন একক।"

সিতাংশু বললেন, "না, দেশ তত কাল অপেক্ষা করবে না। গান্ধীবাদীদের বাদ দিয়েই ভাবতে হবে। এ যুগ তাদের যুগ নয়।"

"তা হলে যুগটা কাদের?" জিজ্ঞাসা করলেন বিমলেন্দু।

"যারা ভালো মানুষ তাদের নয়। যারা ডানপিটে তাদের। দুনিয়ার অন্যান্য দেশের দিকে চেয়ে দেখ। যেমন ডানপিটে ইঙ্গ-মার্কিন দল, তেমনি ডানপিটে রুশ-চীন দল। এদেশেও তাদের জুড়ি আছে। দরকার হলেই তারা মারামারি কাড়াকাড়ি বাধাবে। গান্ধীবাদীদের মানবে কে?" উত্তর দিলেন সিতাংশু।

"না, না, এ আমাদের আধ্যাত্মিক দেশ। এখানে ওসব হবে না।" বিমলেন্দু বললেন। "গান্ধী নেই, কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ রয়েছেন।"

"পনেরোই অগাস্ট তাঁর আবির্ভাব দিবস।" পত্রনবীশ বললেন।

"কিন্তু তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক দেশের নেতৃত্ব করতে দেরি করছেন কেন? এখন তো গান্ধীজী নেই।" বললেন সিতাংশু।

"গান্ধীজী নেই, কিন্তু তার ছায়া ঘুরছে দিল্লীর রাজপথে। লগ্ন এখনো অনুকূল হয়নি। অন্ধকার যতই নিবিড় হবে ততই নিকট হয়ে আসবে তাঁর অভ্যুদয় ক্ষণ। আমরা আশা করছি তিনি এসে আমাদের অঙ্গহানি দূর করবেন।" পত্রনবীশ বললেন।

"তার মানে," সিতাংশু সুধালেন, "পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ?"

"সেটা তোমাদের অনুমানের উপর ছেড়ে দেওয়া ভালো।"

"বুঝেছি।" সিতাংশু বললেন, "কিন্তু তা হলে পাকিস্থানের দোস্ত ইঙ্গ-মার্কিনের সঙ্গেও যুদ্ধ করতে হবে। তোমরা যদি এতে রাজী থাক আমরাও রাজী। উপলক্ষ যাই হোক না কেন, ইঙ্গ-মার্কিনের সঙ্গে এক হাত লড়তে হবে। ওরাই তো প্রতিবিপ্লবের মূর্ত প্রতীক।"

পত্রনবীশ এর জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। চুপ করলেন।

লেন্দু বললেন, "থাক, থাক, ওসব যুদ্ধ-বিগ্রহে কাজ নেই। আধ্যাত্মিক শক্তি যখন প্রবল হবে তখন বিনা যুদ্ধেই যুদ্ধের ফল হবে। মুনিঋষিরা অভিশাপ দিয়ে কাজ হাসিল করতেন। গান্ধীজী করতেন অনশন দিয়ে। শ্রীঅরবিন্দ করবেন যৌগিক প্রক্রিয়ায়।"

স্বয়ম্ভূ বললেন, "তামাসা রাখ। ডিসিপ্লিন, কঠোর ডিসিপ্লিন ভিন্ন উদ্ধারের পথ নেই। প্রথমে ডিসিপ্লিন, তার পরে প্রয়োজন হলে সংগ্রাম।"

বিমলেন্দু হাসলেন। "তার মানে অন্তহীন ত্যাগ। কে আজ তার জন্যে প্রস্তুত! দুঃখ তো আমার ওইখানে। ত্যাগের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছি আমরা। সেইজন্যে এমন অবসন্ন, নিরুদ্যম, হতাশ।"

(১৯৫০)

গান্ধীজন্ম

"যে যুগে আমরা বাস করছি," বন্ধু বললেন, "সে যুগ শুরু হয়েছে স্বাধীনতার বহু পূর্বে। সারা হবে স্বাধীনতার অনেক পরে। স্বাধীনতা হচ্ছে মাঝখানকার একটা অধ্যায়।"

"কী মনে করে ও কথা বললে?" জিজ্ঞাসা করল বিমু।

"ইতিহাস পড়তে পড়তে মনে এলো ও কথা। ইংলণ্ডের শক্তির মূলে তার শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার। আমেরিকার শক্তির মূলেও তাই। রাশিয়ার শক্তির মূলেও তাই। এদের প্রত্যেকের ইতিহাসে এক দিন না এক দিন ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন ঘটেছে। আগে ইংলণ্ডের, তার পরে আমেরিকার, তার পরে রাশিয়ার। ইংলণ্ডের আঁচলে বাঁধা থাকলে আমেরিকার ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন ঘটত না, সেইজন্যে আমেরিকা ইংলণ্ডের আঁচল থেকে আপনাকে মুক্ত করল। জারের কবলে থাকলে রাশিয়ার ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন ঘটত না, সেইজন্য রাশিয়া আপনাকে জারের কবল থেকে উদ্ধার করল। ভারত যে আপনাকে ইংলণ্ডের নাগপাশ থেকে ছাড়িয়ে নিয়েছে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন ঘটানো। এটা যদি ধনিকদের নেতৃত্বে ঘটে তো ভালোই, নয়তো শ্রমিকদের নেতৃত্বে ঘটবে। কিন্তু এটা ঘটবেই। এ যদি না ঘটে তবে আমাদের স্বাধীনতার কোনো মানে হয় না। স্বাধীনতা মানে প্রাচীন কালে ফিরে যাবার স্বাধীনতা নয়।"

"তা তো নয়ই। কিন্তু ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন বলতে ইংলণ্ড আমেরিকার তথা রাশিয়ায় যা বোঝায় তা তো যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি। শিল্প-বাণিজ্যে যে যত বেশী অগ্রগণ্য যুদ্ধের জন্যে সে-ই তত বেশী প্রস্তুত। যুদ্ধ একদিন বাধবেই। বাধবে কি, বেধে গেছে। তখন ওরা পরস্পরকে ধ্বংস করতে করতে এমন এক জায়গায় পৌঁছবে যেখানে আজ আমরা দাঁড়িয়ে আছি। কেন তা হলে আমরা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের দিকে পা বাড়াব?"

"পা বাড়াব কি, পা বাড়িয়ে রয়েছি। আমাদের ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভ-লিউশন গত দুই মহাযুদ্ধের মরশুমে আরম্ভ হয়ে গেছে। যুদ্ধকে তুমি এত ভয় কর কেন? যুদ্ধ চিরকাল থাকবে। যুদ্ধ এমন কিছু ধ্বংস করে না যার পুনর্গঠন নেই। মানুষও আবার জন্মায়।"

বিনু বলল, "যুদ্ধ চিরকাল ছিল, এ কথা মানি। কিন্তু যুদ্ধ চিরকাল থাকবে, এ আমি মানব না। যুদ্ধের পিছনে এমন কোনো শাশ্বত নিয়ম কাজ করছে না যার দরুণ যুদ্ধ চিরকাল বাধবেই। ধরো, সামনের মহাযুদ্ধে যদি আমেরিকা জয়ী হয় তা হলে তার সঙ্গে যুদ্ধ করার সাহস আর কোনো নেশনের হবে না। অথবা যদি রাশিয়া জয়ী হয় তা হলে তার সঙ্গে যুদ্ধে নামবার আস্পর্ধা আর কোনো দেশের হবে না। যুদ্ধ চিরকাল থাকবে, এটা একটা ভুল ধারণা। তবে ন্যায়ের জন্যে সংগ্রাম চিরকাল থাকবে।"

বন্ধু বললেন, "তুমি দেখবে সামনের মহাযুদ্ধও শেষ নয়। তার পরে আরও আছে। আমার তো মনে হয় না যে এই পরম্পরার কোনো

আদি ছিল বা অন্ত আছে। মানুষ যতদিন ক্লান্ত থাকে তত দিন শান্তির মন্ত্র আওড়ায়। ক্লান্তিমোচনের পর বলে, যুদ্ধং দেহি। ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী, তা সে জানে। ধ্বংসের পরে আসে পুনর্গঠনের পালা। নূতন সৃষ্টি পুরাতন সৃষ্টিকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যায়। এমনি করেই প্রগতি হয়। তুমি যদি যুদ্ধের বিরোধিতা কর তা হলে প্রগতির বিরোধিতাই করবে।"

"আমি বিশ্বাস করি না যে মানুষের স্বভাব কোনো দিন বদলাবে না। আমরা যারা গান্ধীজীকে দেখেছি, চিনেছি, ভালোবেসেছি, তারা বিশ্বাস করি যে মানুষ মাত্রেরই এক দিন অন্তঃপরিবর্তন হবে। সে দিন হয়তো দশ বিশ বছরের মধ্যে নয়, হয়তো দু'চার শতকের মধ্যে নয়, মানুষের ইতিহাসে দু'চার শতক এমন কিছু বেশী সময় নয়। কিন্তু আসবেই একদিন। আসবে গান্ধীজীর মতো বহুজনের আত্মদানে। তাঁর মতো প্রেমিক ও শহীদ যদি লাখে লাখে উদয় হয় তা হলে সামনের পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই বিশ্বব্যাপী অন্তঃপরিবর্তন সম্ভবপর। তখন যে বহিঃ-পরিবর্তন হবে তা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বিপ্লব। সে প্রগতির তুলনায় তোমাদের এ প্রগতি নিষ্প্রভ। আমরা সেই প্রগতির ধ্যান করি, যে প্রগতি মানুষকে আরো উচ্চ স্তরে তুলে দেবে। যা শুধু প্রগতি নয়, যা ঊর্ধ্বগতি।"

"প্রেমিক ও শহীদ লাখে লাখে উদয় হয় না, ভাই। হবেও না। লাখে লাখে দূরের কথা, হাজারে হাজারে নয়। এই ত্রিশ বছরে ত্রিশটিও দেখা গেল না। সামনের পঞ্চাশ বছরে পঞ্চাশটি দেখলে আশ্চর্য হব। তুমি বাস্তববাদী নও বলেই অমন প্রগতির ধ্যান করছ। মানুষ

চিরকাল যা করেছে চিরকাল তাই করবে, মারামারি হানাহানি সত্ত্বেও এগিয়ে যাবে, ধ্বংসস্তূপের উপর নবীন সৃষ্টি গড়ে তুলবে। আবার ভাঙবে, আবার গড়বে। এমনি করেই প্রগতির পরিচয় দেবে।"

বিনু বলল, "তুমি ইতিহাস পড়েছ, কিন্তু ইতিহাস তৈরি করনি। আমরা ইতিহাস তৈরি করব। যা কোনো দিন হয়নি তাই এক দিন আমাদের দ্বারা হবে।"

"রাজা অশোকও ভাবতেন ও কথা। তাঁর ভাবনা তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই নিশ্চিহ্ন হলো। পড়ে আছে গুটিকয়েক শিলালিপি। পণ্ডিত ভিন্ন আর কেউ তার পাঠোদ্ধার করতে পারে না। গান্ধীজীর ভাবনা, তোমাদের ভাবনা এক দিন নিশ্চিহ্ন হবে। রেখে যাবে খানকয়েক পুঁথি, কেউ যা পড়বে না।"

"কে জানে, হয়তো তাই হবে।" বিনু বলল নিরাসক্তভাবে। "সব নির্ভর করছে অন্তঃপরিবর্তনের উপরে। গান্ধীজীর আমরণ সাধনার পরেও তোমার অন্তঃপরিবর্তন হয়নি, তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কেবল তোমার কেন, তাঁর যাঁরা শ্রেষ্ঠ সহকর্মী তাঁদেরও হয়নি। আরো হাজার হাজার প্রেমিককে শহীদ হতে হবে এর জন্যে। যত দিন তারা তৈরি না হয়েছে ততদিন ইতিহাস তৈরি করব বললেই ইতিহাস তৈরি হবে না। ততদিন ইতিহাস তার জানা রাস্তায় চলবে। যুদ্ধ, বিপ্লব, প্রতিবিপ্লব, ক্লান্তি, শান্তি, পুনরায় যুদ্ধ ইত্যাদি।"

"কিন্তু অজানা রাস্তার যে কোনো ঐতিহাসিক নজির নেই। তোমরা যে আশা করছ তা আকাশকুসুম। সেই জন্যে অত সহজে

হতাশ হচ্ছ। আমার মতো যদি ইতিহাস পড়তে তা হলে ইতিহাস তৈরি করার খেয়াল ছেড়ে দিয়ে জানা রাস্তায় চলতে। জানা রাস্তায় অতখানি প্রেরণা নেই, কিন্তু এটা নির্ভরযোগ্য। এই যেমন আমি নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন হবেই। ধনিক নেতৃত্বে যদি না হয়, তবে শ্রমিক নেতৃত্ব হবে।”

“আমি কিন্তু অতটা নিশ্চিত নই। যে সব দেশে ধনিক নেতৃত্ব সে সব দেশে ডিপ্রেসন শুরু হয়ে গেছে। ডিপ্রেসন থেকে রক্ষা পাবার অন্য উপায় নেই দেখে তারা যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। তাতে বহু বেকারকে কাজ দেবার সুবিধে। বহু বেকারকে বধ করারও সুবিধে। যে সব দেশে শ্রমিক নেতৃত্ব সে সব দেশে বেকার নেই, কিন্তু যারা বেকার হতে পারত তারা বেগার দিতে বাধ্য হয়। সেখানেও সেই যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি। আমাদের দেশে এখন ধনিক নেতৃত্ব। তাই ডিপ্রেসন। তাই বেকারকে কাজ দেবার জন্যে যুদ্ধের প্রস্তুতি। যদি শ্রমিক নেতৃত্ব হয় তা হলে শ্রমিকদের অনেকে বেগার দেবে। চলতে থাকবে যুদ্ধের প্রস্তুতি। দুটোর যে কোনো একটা পথে চলতে গেলে দেখবে পথের শেষে যুদ্ধ। সুতরাং ধ্বংস। গত দুই মহাযুদ্ধে ধ্বংসের ধাক্কা সামলাতে হয়নি বলে তোমরা শুধু ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি। এবার ফাঁদও দেখবে। তখন তোমরাই তোমাদের ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন ঠেকাবে।”

“ধ্বংসকে তুমি এত ভয় কর কেন?” বন্ধু বললেন, “ধ্বংস যখন হবে তখন হবে। তার আগে দেশটা সমৃদ্ধ হোক, কলকারখানায় ছেয়ে যাক। মানুষগুলো অন্ধকার থেকে আলোকে আসুক। হয় মার্কিনের

মতো, নয় রুশের মতো জীবন্ত হোক। মরবে একদিন মহাযুদ্ধে, তা বলে জ্যান্ত মানুষের মতো বাঁচবে না!"

"আমিও চাই যে তারা জ্যান্ত মানুষের মতো বাঁচে।" বিনু বলল, "কিন্তু তারা কি বাঁচতে ও বাঁচাতে চায়! তারা চায় মারতে ও মরতে। নেশাখোর যেমন নেশা না হলে বাঁচে না, এরা তেমনি হিংসা না হলে বাঁচে না। এরা হিংসাখোর। এই হিংস্র প্রাণীদের নখদন্ত বিজ্ঞানের কল্যাণে অসাধারণ উৎকর্ষ লাভ করেছে। তাই দিয়ে এরা পরস্পরকে ক্ষতবিক্ষত করবে, নির্বংশ করবে। এর ফলে প্রগতি হয়তো কিছু হবে। সমাজের গড়ন হয়তো কিছু বদলাবে। যারা পায়ের তলায় ছিল তারা হয়তো মাথার উপর চড়বে। কিন্তু অনেক মরে ঝরে যে ক'জন অবশিষ্ট থাকবে তারা আর একটা যুদ্ধের আশঙ্কায় দিন গুণবে, যদি না এক পক্ষ সম্পূর্ণভাবে বিশ্বজয়ী হয়।"

"কী হবে না হবে তা এখন থেকে ভেবে কাজ নেই। শুধু এইটুকু ভাবলে চলবে যে আজকের দুনিয়ায় বাস করতে হলে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভ-লিউশনের ভিতর দিয়ে যেতে হবে। ইংলণ্ড গেছে, আমেরিকা গেছে, রাশিয়া যাচ্ছে, চীন যাবে, ভারত যাবে। এর দরুন যদি যুদ্ধের ভিতর দিয়ে যেতে হয়, যেতে হবে ধ্বংসের ভিতর দিয়ে। বুকের পাটা শক্ত করতে হবে। তা নয়, কেবল গান্ধী গান্ধী বলে অরণ্যে রোদন ও মান্ধাতার আমলের চরকায় সূত্র কর্তন। এমন করে কি প্রগতি হয়?"

"বেশ তো। তোমাদের হাতে ক্ষমতা। তোমরা ইচ্ছা করলে দেশটাকে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের ভিতর দিয়ে নিয়ে যেতে, যুদ্ধের

ভিতর দিয়ে নিয়ে যেতে পারো। তবে আমাদের নৈতিক সমর্থন আশা কোরো না। আমরা যদি দেখি যে তোমরা অপরের উপর বলপ্রয়োগ করছ না, অপরের সম্মতি পাচ্ছ, তা হলে কিছু বলব না। নয়তো প্রতিবাদ করব। প্রতিবাদ একদিন প্রতিরোধে পরিণত হবে, যদি কন্‌স্ক্রিপসন চালাতে যাও, যদি বেগার খাটাতে চেষ্টা কর। তখন হয়তো দেখবে শত শত প্রেমিক শহীদ হতে উদ্যত। গান্ধীর রক্ত শুকিয়ে যায় নি। ভারতের মৃত্তিকাকে উর্বর করেছে। এ মাটিতে আরো অনেক প্রেমিক, আরো অনেক শহীদ জন্মাবে। শেষ পর্যন্ত তাদের ইচ্ছাই জয়ী হবে, তাদের ধ্যানই মূর্তি ধরবে। প্রথমে অন্তঃ-পরিবর্তন, তার পরে বহিঃপরিবর্তন।"

"অন্তঃপরিবর্তন!" বন্ধু হাসলেন। "ওটা তোমাদেরই হওয়া উচিত। দেশটাকে তোমরা মধ্যযুগের ঘাটে বেঁধে রাখতে চাও। তাকে বর্তমান যুগের মাঝ দরিয়ায় ভাসতে দেবে না। প্রতিবাদ করবে, প্রতিরোধ করবে। কিন্তু গতিরোধ করতে পারবে কি? দেখা যাক, ক'জন গান্ধী-বাদী বুকে গুলি খায়!"

"কুকুরকে বদনাম দিয়ে গাছে ফাঁসি দেবার প্রবাদ আছে। তেমনি গান্ধীবাদীদের মধ্যযুগীয় বলে বদনাম দিয়ে বিদায় করা হবে। কিন্তু আসলে তারা মধ্যযুগীয় নয়। তারাও এ যুগের লোক। মধ্যযুগে গান্ধীর মতো কেউ কোনো দেশে জন্মাননি। তখন হিংসা নামক নেশাটা জনগণের মধ্যে ছড়ায়নি। বড় বড় কলকারখানার জন্যে ছলে বলে কৌশলে অগণিত শ্রমিক সংগ্রহ করা হয়নি। মধ্যযুগ নয়, বর্তমান

যুগই গান্ধীজীর যুগ। এ যুগের ভাগ্যবিধাতারা যদি হিংসার নেশাটাকে সমাজের সর্ব স্তরে ছড়িয়ে না দিতেন তা হলে গান্ধীজন্মের প্রয়োজন হতো না। প্রয়োজন হতো না তাঁর আবির্ভাবের, যদি অগণিত শ্রমিককে তাদের গ্রাম থেকে, তাদের ঘরবাড়ী থেকে, তাদের প্রিয়জনের কাছ থেকে ভুলিয়ে এনে, ছিনিয়ে এনে কলকারখানার আশেপাশে নজরবন্দী করা না হতো। তাদের অপর একটা জীবিকা ছিল, অনেক ক্ষেত্রে তাদের জীবিকাকে ধ্বংস করা হয়েছে যাতে তারা কলকারখানায় কাজ নিতে বাধ্য হয়। হঠাৎ মনে হয় প্রতিযোগিতায় ধ্বংস হলো, কিন্তু অন্যায় উপায়ে ধ্বংস করা হয়েছে। রাষ্ট্র প্রতিকূল না হলে প্রতিযোগিতায় ধ্বংস করা সহজ নয়। রাষ্ট্র অনুকূল হলে তো নয়ই। এ যুগের ভাগ্যবিধাতারা নিজেদের দুষ্কৃতির দ্বারা ডেকে এনেছেন গান্ধীকে, যেমন কংস ডেকে এনেছিল কৃষ্ণকে। রাবণ ডেকে এনেছিল রামকে।"

"বাজে বকছ," বন্ধু হেসে উড়িয়ে দিলেন। "কিন্তু মধ্যযুগে ফিরে যাওয়া ভিন্ন তোমাদের আর কী করণীয় আছে?"

"আমরা মধ্যযুগের লোক হলে তো মধ্যযুগে ফিরে যাওয়ার কথা উঠবে? আমরা এই যুগেরই সন্তান। আমরাও এগিয়ে যেতে চাই, পেছিয়ে যেতে নয়। কিন্তু আমাদের অগ্রগতি অন্তঃপরিবর্তনের ভিতর দিয়ে শান্তির ভিতর দিয়ে। আমরা চাই যে-যার নিজের ঘরবাড়ীতে নিজের প্রিয়জনের সঙ্গে থেকে কাজ করুক, একজনের কাজ আর এক জনের কাজের পরিপূরক হোক, একজন ছাতা তৈরি করুক, আর এক জন তৈরি করুক জুতো, আর এক জন মাছ ধরে নিয়ে আসুক, আর এক জন

আসুক নিজের ক্ষেতের ধান, সকলে মিলে একটা সমাজ করুক, যে সমাজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তারা প্রত্যেকে। প্রত্যেকে প্রত্যেকের সহযোগী, কেউ কারো প্রতিযোগী নয়। একজনের বা একটি গোষ্ঠীর লাভের জন্যে উৎপাদন করা হবে না, উৎপাদন করা হবে সকলের প্রয়োজন মেটাতে। কেউ কোনো রকম উপস্বত্ব পাবে না, পাবে উপযুক্ত পারিশ্রমিক বা প্রয়োজনীয় ভোজ্য ও ভোগ্য। যারা কায়িক শ্রমের চেয়ে মানসিক শ্রমে স্বভাবত পটু তারা মানসিক শ্রমের দ্বারা সহযোগিতা করবে। তারা বুদ্ধিমান বলে পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাবে, এটা চলবে না। যারা স্বভাবত সাহসী ও বলবান তারা আর পাঁচজনকে ভয় দেখিয়ে শাসন ও শোষণ করবে, এমনটি হতে দেওয়া হবে না। তারা আর পাঁচজনকে রক্ষা করবে, সেইভাবে সহযোগিতা করবে। যারা ধনসম্পদ বৃদ্ধি করার কৌশল জানে, ব্যবসা-বাণিজ্যে স্বভাবসিদ্ধ, তারাও করবে সহযোগিতা। তারা আর পাঁচজনের পরিশ্রমের ফল দিয়ে নিজেদের ভাণ্ডার ভরাবে না। এমন যে সমাজ এর শান্তি ও শৃঙ্খলা বিধান আপনা হতেই হবে। পুলিশ লাগবে না। যদি লাগে তবে অল্পসংখ্যক। বাইরে থেকে একদিন আক্রমণ আসতে পারে এই আশঙ্কায় একটা সৈন্যদল খাড়া রাখতে হবে না। দরকার হলে স্বেচ্ছাসৈনিক সংগ্রহ করে বিপদের সম্মুখীন হওয়া যাবে। নয়তো সত্যাগ্রহ করা যাবে।”

“এ স্বপ্ন আজকের নয়।” বন্ধু হেসে বললেন, “আদিকাল থেকে যেখানে যত ইউটোপিয়ান জন্মেছে সকলে দেখেছে এই স্বপ্ন বা এর রকমফের। রূঢ় বাস্তব তাদের স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছে। কারণ মানুষকে তারা

যতটা নিঃস্বার্থ মনে করেছে মানুষ ততটা নয়। নিজেদের নিঃস্বার্থতা দিয়ে তারা আর পাঁচজনের নিঃস্বার্থতার পরিমাপ করেছে। সেটা ভুল! গান্ধীজীর বেলাও সেই ভুল ঘটেছে। তবে একটা জায়গায় তিনি তাঁর পূর্বগামী স্বপ্নদ্রষ্টাদের চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে গেছেন। সেটা সত্যাগ্রহ বা সাত্ত্বিক প্রতিরোধ। তাকে আমরা সকলেই ভয় করি। দেশ যদি আবার পরপদানত হয় তা হলে সত্যাগ্রহীদের সাত্ত্বিক প্রতিরোধকে তারা ভয় করবে। ইতিহাসে এই একটা নতুন জিনিস দেখলুম। এই জন্যে গান্ধীজন্মের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু অহিংস সমাজ! হায় বন্ধু, সে আশা দুরাশা!"

"আমাদের আর কোনো দুরাশা নেই, ঐ একটি দুরাশাই আছে। মানুষ বাঁচে আশা নিয়ে। আমরাও বাঁচব। গান্ধীজী আমাদের মনে আশা জাগিয়ে দিয়ে গেছেন, উপায় দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। আমরা তাঁকে ভুলব না। তিনি যদি ভুল করে থাকেন তবু সেই ভুলও আমাদের পক্ষে শ্রেয়। তোমরা ঠিক করে যাও, আমরা ভুল করে যাই। তার পর ইতিহাস বিচার করবে কোন্ পথে প্রগতি।"

(১৯৫০)

জমি কার

ভদ্রলোক পূর্ববঙ্গের জোতদার। বাড়ীতে সাম্যবাদী ইস্তাহার পেয়ে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। বহু দুর্ভোগের পর তিনি মুক্ত হন। তার পরে কলকাতা চলে আসেন। বিনু তাঁর পুরাতন আলাপী। দেখা করতে এসেছেন বিনুর সঙ্গে।

বললেন, "ভারতবর্ষের মাটিতে কমিউনিজম গজাবে এ কখনো আমি বিশ্বাস করিনে। ইস্তাহার রেখেছিল আমার ছেলে। আজকালকার ছেলেদের উপর মা-বাপের এক্তার নেই। অকারণে ভুগতে হলো এ বয়সে আমাকে।"

বিনু তাঁকে সহানুভূতি জানাল। তার পরে বলল, "রুশদেশ সম্বন্ধে ডস্টয়েভস্কি ওকথা লিখেছিলেন। চীনদেশের বিদ্বানদেরও ধারণা ছিল অনুরূপ। তবু দেখা যাচ্ছে রুশ চীন লাল হয়ে গেছে। কোন্‌খানকার মাটিতে কী গজায় না গজায় সে সম্বন্ধে কেউ কিছু জোর করে বলতে পারে না এ যুগে। নইলে আপনার ছেলে রাখে সাম্যবাদী ইস্তাহার!"

"তা হলে কি প্রাইভেট এণ্টারপ্রাইজ বলে কিছু থাকবে না? রাষ্ট্র সব কিছু চালাবে? চালাতে চাইলে কি চলবে?"

"প্রাইভেট এণ্টারপ্রাইজের কথা বলেছেন? বলুন দেখি, গত দেড়শো বছরে জমিদার কিম্বা তালুকদার কিম্বা জোতদার জমিতে

ক'টাকা ঢেলেছেন? জমি থেকে যত টাকা উঠিয়েছেন তার সিকির সিকি জমির উন্নতির জন্য ব্যয় করেছেন কি?"

ভদ্রলোক বললেন, "না।"

"তা হলে দেখুন, জমিতে টাকা ঢালতে কেউ রাজী নয়। চাষীর টাকা থাকলে সে হয়তো টাকা ঢালত কিন্তু তার টাকা নেই। তা ছাড়া তার আশঙ্কা জমির খাজনা বৃদ্ধি হবে। কিম্বা জমি বেহাত হয়ে যাবে। সেই ভয়ে সে টাকা থাকলেও ঢালতে নারাজ। কী করে তা হলে আশা করেন যে প্রাইভেট এণ্টারপ্রাইজের উপর জমির ভার ছেড়ে দিয়ে রাষ্ট্রনায়করা নিশ্চিন্ত হবেন? এই যে খাদ্যসঙ্কট ঘনিয়ে আসছে এটা যখন আর একটু ঘনাবে, যখন বাইরে থেকে খাদ্য আমদানি বন্ধ হবে, তখন প্রাইভেট এণ্টারপ্রাইজের উপর বরাত দিয়ে বসে থাকলে দেশের লোক না খেতে পেয়ে মারা যাবে। তখন অধিকতর ফসল ফলাতে হলে জমিতে টাকা ঢালতে হবে। রাষ্ট্রই ঢালবে যে টাকা। সুতরাং রাষ্ট্রই হুকুম করবে কোন্ জমিতে কী চাষ করা হবে, কত ফসল ফলাতে হবে, রাষ্ট্রকে দিতে হবে কত, জমিদারের প্রাপ্য কত, চাষীর প্রাপ্য কত। এক বার রাষ্ট্র আসরে নামলে প্রাইভেট এণ্টারপ্রাইজের দফা রফা।"

ভদ্রলোক বললেন, "আপনি কি তার পক্ষপাতী?"

বিনু বলল, "না, আমি তার পক্ষপাতী নই। কিন্তু কেউ যদি টাকা না ঢালে তবে জমির উন্নতি হবে না, জমির উন্নতি না হলে ফসলের পরিমাণ বাড়বে না, ফসলের পরিমাণ না বাড়লে রেশনের পরিমাণ

বাড়বে না, রেশন প্রথা উঠে যাওয়া তো দূরের কথা। কে টাকা ঢালবে? জমিদার? তালুকদার? জোতদার?"

"না।" ভদ্রলোক স্বীকার করলেন যে সে রকম মতিগতি তাঁদের নেই।

"চাষীর হাতে টাকা থাকলে তো সে ঢালবে। আর থাকলেও সে ঢালবে কেন, যদি জমির উপর তার স্বত্ব আমেরিকার বা ফ্রান্সের মতো সর্বময় স্বত্ব না হয়? তা হলে দাড়াচ্ছে রাষ্ট্রকেই টাকা ঢালতে হবে। যে টাকা ঢালবে সে সুদে আসলে উশুল করবে। এই তো নিয়ম।"

ভদ্রলোক মেনে নিলেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করলেন, "আর কোনো বিকল্প নেই কি?"

"আছে। কিন্তু সেটা আপনার ভালো লাগবে না। সেটা শ্রুতিমধুর নয়।"

"তবু শুনি।"

"বিকল্প হচ্ছে, লাঙল যার জমি তার। তার উপরে যতগুলো স্বত্ব আছে সব স্বত্ব লোপ করা। এমন কি, রাষ্ট্র যে ল্যাণ্ড রেভিনিউ আদায় করে তাও লোপ করতে হবে। ঠিক যেমন আমেরিকায় বা ফ্রান্সে।"

"আমার যে আড়াইশো বিঘা জমি আছে। আমি কোথায় দাঁড়াব?"

"আপনি সপরিবারে যতটা পারেন চাষ করবেন। বাকীটার মমতা কাটাবেন। নয়তো আপনি রাজী হয়ে যান টাকা ঢালতে। জমির উন্নতি করতে। ফসলের পরিমাণ যাতে বাড়ে তার ব্যবস্থা করতে।"

তিনি মাথা নাড়লেন : "সে আমি পারব না।"

"পারবেন না তো।" বিন্নু হেসে বলল, "তা হলে যে পারবে সে-ই এক দিন জমির মালিক হবে। দেশের লোক খেতে না পেলে দেশের সরকার যত রকম উপায় আছে সব রকম উপায় পরীক্ষা করে দেখবে। শেষ পর্যন্ত রাশিয়ার মতো স্টেট ফার্ম বা কলেকটিভ ফার্ম করবে। অথবা আমেরিকার মতো, ফ্রান্সের মতো চাষীকেই মালিক বলে ঘোষণা করবে। খেসারতের দাবি অবশ্য উঠবে। কিন্তু যে দলের হাতে গবর্নমেণ্ট থাকবে সে দল খেসারৎ দিতে রাজী হবে কি না বলা যায় না, দিলেও কতটুকু দেবে তাও বলা যায় না। মোট কথা, চাষবাসের একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না করলে চাষীরা জমির উন্নতির জন্যে টাকা ঢালবে না।"

ভদ্রলোক বললেন, "টাকা থাকলে তো টাকা ঢালবে। সাধারণ চাষীর হাতে টাকা জমে না।"

বিন্নু ভেবে বলল, "সেইজন্যে আমার আশঙ্কা হয় যে চাষীর হাতে জমি যাবে না, যাবে রাষ্ট্রের হাতে। তবে উত্তর প্রদেশের উদাহরণ দেখে আশাও হয় যে চাষীর হাতেই যাবে। চাষীরা যদি একজোট হয়ে সমবায় পদ্ধতিতে চাষ করে তা হলে সকলে মিলে টাকা ঢালবে, সকলে মিলে শ্রম ঢালবে। সেই ভাবে জমির উন্নতি হবে, ফসলের পরিমাণ বাড়বে।"

"সমবায়!" ভদ্রলোক বললেন, "সমবায়ের যে নমুনা দেখা গেল এ দেশে তার পরে অতি বড় আশাবাদীরও আশা নেই ওর উপর।"

"ইহুদীরা প্যালেস্টাইনে চাষবাসের আশ্চর্য উন্নতি দেখিয়েছে। তারা

সংঘবদ্ধ হয়ে চাষ করে। যা উৎপন্ন হয় তা সকলে মিলে ভাগ করে নেয়। চেষ্টা করলে এ দেশেও সেটা সম্ভব।"

"এ দেশে," ভদ্রলোক বিশ্বাস করলেন না, বললেন, "সম্ভব হবে না।"

"তা যদি সম্ভব না হয় তবে অগত্যা রাষ্ট্রকেই হস্তক্ষেপ করতে হবে। তখন রাষ্ট্রই চালাবে চাষবাস। যারা চাষ করবে তারা রাষ্ট্রের ফরমাসে করবে। নিজের মর্জিতে নয়। খাদ্যসঙ্কট দূর হতে পারে এই উপায়ে, রাশিয়া তার নজির।"

ভদ্রলোক বললেন, "কিন্তু সেটা কি ভালো হবে? উদ্‌যোগিতা বা পুরুষকার বলে কিছু থাকবে না? কর্তার ইচ্ছায় কর্ম?"

"আমিও সে কথা বলে থাকি। কিন্তু সমাধান আর কী ভাবে হতে পারে, গোড়াতেই যদি আপনি ধরে নেন যে প্যালেস্টাইনের ইহুদীদের মতো সংঘবদ্ধ চাষ এদেশে সম্ভব নয়? চাষীরা যদি সংঘবদ্ধ না হয় তা হলে তাদের হাত থেকে জমি ক্রমে রাষ্ট্রের হাতে চলে যাবেই। আধপেটা খেয়ে এ দেশের লোক ক'দিন বাঁচবে, ক'দিন খাটবে? কী করে দেশের কাজকর্ম চলবে! খাদ্যসঙ্কট আর একটু তীব্র হলেই কথা উঠবে জমিতে হস্তক্ষেপ করবার। অথবা চাষীকে সংঘবদ্ধ করবার।"

"রাশিয়ার ইতিহাসে পড়েছি কলেকটিভ ফার্মের সূচনা কেমন করে হলো। আমার ছেলে আমাকে অনেক বই পড়তে দিয়েছে। তবু কমিউনিস্ট বানাতে পারেনি।"

"কলেকটিভ ফার্ম ওরাও চায়নি। ওরাও চাষীকে জমি দিয়েছিল। কিন্তু খাদ্যসঙ্কট যখন ভয়াবহ হলো তখন ওরা হস্তক্ষেপ করল।"

ভদ্রলোক বললেন, "হাঁ, একটা কিছু করা দরকার। তবে কী করা দরকার তা মাথায় আসছে না। আমরা কি তবে ধ্বংসোন্মুখ ?"

বিনু বলল, "সমাজের যখন যেটা প্রয়োজন তখন সেটা করলে ধ্বংসোন্মুখ হবার ভয় থাকে না। এই খাদ্যসঙ্কটে সমাজের যা প্রয়োজন তা প্রচুর এবং পুষ্টিকর খাদ্য। প্রতিদিন আমরা এর অভাব অনুভব করছি। যাদের অবস্থা খারাপ তারা তো একবেলা না খেয়ে আছে। আর এক বেলা আধপেটা খায়। তাও পুষ্টিকর নয়। এ সঙ্কট বেশী দূর গড়ালে গবর্ন্মেণ্ট বদলাবে। হয়তো বিপ্লব ঘটবে। ফরাসী বিপ্লব বলুন, রুশ বিপ্লব বলুন, খাদ্যসঙ্কটেই তার সূচনা। সুতরাং সময় থাকতে সতর্ক হতে হবে। প্রত্যেকটা উপায় পরীক্ষা করে যদি দেখা যায় যে শেষ উপায় হচ্ছে চাষীর হাতে জমির সর্ব স্বত্ব সমর্পণ, তবে আপনাকে হাল লাঙল নিয়ে মাঠে নামতে হবে। আর যদি সেরা উপায় হয় স্টেট ফার্ম বা কলেকটিভ ফার্ম তা হলে প্রাইভেট এণ্টারপ্রাইজের নামে জিভ কাটলে চলবে কেন ?"

"তা বটে।" ভদ্রলোক সায় দিলেন।

এর পরে বিনু বলতে লাগল, "অবশ্য এই যথেষ্ট নয়। উৎপাদনের সমস্যা মিটলেও বিনিময়ের সমস্যা অত সহজে মিটবে না। চাষীর হাতেই যদি চাষের দায়িত্ব থাকে তবে সে যে টাকাটা ঢালবে সেটা সুদে আসলে আদায় করে নিতে চাইবে। কিন্তু সে তার উৎপন্ন শস্যের জন্যে যে মূল্য

প্রত্যাশা করবে সে মূল্য দিতে হয়তো কর্তারা কার্পণ্য করবেন। ইন্‌ফ্লেশনের ভয় আছে। এই সমস্যার সমাধান হচ্ছে কাপড় কেরোসিন ইত্যাদি যেসব জিনিস চাষীদের দরকার সে সব জিনিস কম দামে তাদের জোগানো। কিন্তু কম দামে জোগানো দূরের কথা, পর্যাপ্ত পরিমাণে জোগানো সহজ নয়। এত কলকারখানা আমাদের নেই, বাইরে থেকে আমদানি করতে গেলে ডলারের অভাব। এসব জিনিস এক দিন বাধ্য হয়ে গ্রামে গ্রামে উৎপাদন করিয়ে নিতে হবে কুটীরশিল্পের দ্বারা। অবশ্য কেরোসিন নয়, করোগেট নয়। এ ছাড়া আমি আর কোনো ন্যায়সঙ্গত উপায় দেখছিনে। চাষীদের কাছ থেকে কম দামে ফসল কেড়ে নিয়ে আসা অথচ তাদের কম দামে কাপড় ইত্যাদি জোগাতে না পারা আমার বিবেচনায় ন্যায়সঙ্গত নয়। বর্তমান খাদ্যসঙ্কটের এটাও একটা কারণ। চাষী রাগ করে খাদ্যশস্যের আবাদ কমিয়ে দিয়েছে, তার বদলে পাট তামাক লাগিয়েছে। তাতে বিনিময়ের স্থবিধা।"

ভদ্রলোক বললেন, "এসব আমার জানা ছিল না। অনেক নতুন কথা শোনা গেল। আসব আর এক দিন।"

(১৯৫০)

হাতীর খোরাক

সুশীতলের দিকে ফিরে অধ্যাপক বললেন, "ভায়া, অত অধীর হলে চলবে কেন? এই ক'বছরে যে সব পরিবর্ত্তন আমরা দেখেছি তা নিয়ে বড় একখানা ইতিহাস লেখা যায়। বিদেশী শাসন রহিত হলো, এ কি কম সময়সাপেক্ষ কাজ! আর কেউ কি এ কাজ আরো কম সময়ে পারত! বিখ্যাত একজন বামপন্থী নেতা বলেছিলেন সিপাহী বিদ্রোহের একশো বছর পূর্ণ না হলে দেশ স্বাধীন হবে না। এখন শুনছি তার দশ বছর আগে স্বাধীন হতে গিয়ে বিভক্ত হয়েছে এবং সেটা একটা অপরাধ। হয়তো তাই। অসময়ে স্বাধীন হতে গেলে একটা না একটা বিভ্রাট ঘটে। যেমন নাবালকের বেলায় তেমনি নেশনের বেলায়। আমরা যে হিন্দু মুসলমান মিলে একটা আস্ত নেশন হইনি এটা এক কালে স্বীকার করতে বাধ্‌ত! এখন স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি। সেইজন্যে মনে হয় আরো দশ বছর সবুর করলে নেশন হিসাবে আমরা অখণ্ড হতুম, তার পরে স্বাধীন হতুম। সময় সংক্ষেপ করতে গিয়ে যা হবার তা হয়েছে। এ নিয়ে মন খারাপ করা মিছে।"

নেপলদা বললেন, "দশ বছর কেন, একশো বছর সবুর করলেও হিন্দু মুসলমান মিলে আস্ত একটা নেশন হতো না। যা হবার নয় তার জন্যে স্বাধীনতা পেছিয়ে যেত এটা অসহ্য। সেইজন্যে আমরা দেশবিভাগে রাজি হয়েছি।"

অধ্যাপক বললেন, "তা হলে দেখা যাচ্ছে দোষ ইংরেজের নয়। দোষ আমাদের। এর সুযোগ নিয়ে ইংরেজ এত দিন রাজত্ব করে গেল। ভবিষ্যতে আর কেউ নেবে এর সুযোগ, কেননা স্বাধীন হয়েছি বলে তো আমরা এক হইনি। ঐক্যের অভাব আগে যেমন ছিল এখনো তেমনি আছে। তবে তার আকার প্রকার বদলেছে।"

নেপালদা বললেন, "কিন্তু ওসব পুরোনো কাসুন্দী ঘেঁটে কী হবে। সুশীতল যে প্রশ্ন তুলেছে তার উত্তর কই? বন্যা ও ভূমিকম্প কি এই দেশটাকেই ইজারা নিয়েছে? বেছে বেছে এই দেশেই হয়? পাকিস্তানের লোক পেট ভরে খেতে পায়, আমরা কেন পাইনে?"

অধ্যাপক বললেন, "সেইজন্যেই তো বলছি অত অধীর হলে চলবে কেন! অসময়ে স্বাধীন হয়েছ, দেশটাকে খণ্ড খণ্ড করেছ, অনুতাপের লেশমাত্র লক্ষণ নেই, তোমাদের অন্নাভাব হবে না তো হবে কার! কৃষিপ্রধান অঞ্চলগুলো পাকিস্তানের ভাগে পড়েছে, তাই ওরা পেট ভরে খেতে পাচ্ছে। শিল্পপ্রধান অঞ্চলগুলো তোমাদের ভাগে, তাই তোমরা ওদের চেয়ে অগ্রসর।"

নেপালদা বললেন, "কাপড় উধাও। কাগজ অদৃশ্য। সব জিনিসের দাম আগুন। অতএব আমরা অগ্রসর।"

অধ্যাপক বললেন, "ওদের চেয়ে অগ্রসর। ওদের তুলনায় অগ্রসর।"

সুশীতল বলল, "অগ্রসর হয়েছি বলে কি অনাহারে মরব? এই আমার প্রশ্ন।"

অধ্যাপক বললেন, "না, অনাহারে মরবে কেন? আমেরিকা থেকে

গম আসছে, ইরাক থেকে খেজুর এসেছে। পাকিস্তানের সঙ্গেও চুক্তি হয়েছে, ওরা খাদ্য পাঠাবে।”

সুশীতল বলল, “তা সত্ত্বেও মফঃস্বলের বাজারে ধান চাল আক্রা। এখন থেকে এই। ভাদ্র আশ্বিনে মানুষ কী খেয়ে বাঁচবে? আগে বাঁচলে তো তার পরে অগ্রসর হবে?”

অধ্যাপক মাথায় হাত দিয়ে বললেন, “কঠিন প্রশ্ন। তবে আমার বিশ্বাস আমেরিকা কিছু পাঠালে রাশিয়াও কিছু পাঠাবে। চীন ইতিমধ্যে পাঠিয়েছে।”

নেপালদা হেসে বললেন, “নিরপেক্ষ থাকছি কি সাধে! গাছেরটা খাচ্ছি, তলারটা কুড়োচ্ছি। দুনিয়ার লোক আমাদের চাঁদা করে খাওয়াবে। আমরা কোনো দিকে ঝুঁকব না। দাড়িপাল্লা সমান রাখব।”

সুশীতল বলল, “কিন্তু রাশিয়া যদি কিছু না পাঠায় তা হলে আমেরিকার কাছ থেকে কিছু নেওয়াটা কি উচিত হবে? নিলে মনের ঝোঁকটা কি মার্কিনের দিকে যাবে না?”

অধ্যাপক বললেন, “কতকটা। তবে তার ফলে আমাদের নিরপেক্ষ-তার ইতরবিশেষ হবে না। তেমন যদি দেখি তো খাদ্য আমদানি বন্ধ করে দেব।”

নেপালদা বললেন, “তার পরে অনশন।”

অধ্যাপক বললেন, “কেন, অনশন কেন। দামোদর পরিকল্পনা, রাক্ষি পরিকল্পনা সমাপ্ত হলে খাদ্যের অনটন থাকবে না। অনাবাদী

জমির আবাদ হবে। ভালো গোরু, ভালো সার, ভালো বীজ, এর প্রত্যেকটির উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। সময় দাও, সোনা ফলবে।"

বিনু এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল। নেপালদা বললেন, "বিনু, তুমি নীরব যে।"

বিনু বলল, "আমি নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করছি।"

সুশীতল বলল, "কী নিয়ে বোঝাপড়া?"

বিনু বলল, "সে অনেক কথা। তোমাদের যদি ধৈর্য থাকে তা হলে শোনাতে পারি। কিন্তু ধৈর্য থাকবে না, ঠিক জানি।"

অধ্যাপক বললেন, "আমি বাধা দেব না, তুমি বলে যাও।"

নেপালদা বললেন, "আমি যদি বাধা দিই সেটা ধৈর্যহানির জন্যে নয়, কৌতূহলের জন্যে। আমাকে ভালো করে না বোঝালে আমি কিছু বুঝতে পারিনে। বুদ্ধিশুদ্ধি কম।"

সুশীতল বলল, "আমি যদি বাধা দিই সেটা তর্কবিতর্কের নিয়ম অনুসারে। বিনা বিচারে আমি কিছু মেনে নিতে পারিনে।"

বিনু বলল, "আচ্ছা, তা হলে শোন। চাষীরা যে ফসল ফলায় তার বিনিময়ে তারা পায় টাকা। টাকার বিনিময়ে পায় কাপড়চোপড় ছাতাজুতো আয়নাচিরুণি ঘটিবাটি হাড়িপাতিল তেল নুন লকড়ি। কিন্তু টাকার বিনিময়ে এসব জিনিস পাওয়া আজকাল কঠিন। সেইজন্যে তারা বলে, আরো টাকা দাও। আরো টাকা পেলে আশা করে আরো জিনিস পাবে। কিন্তু সেটা ঠিক নয়। আরো টাকা ছড়ালে আরো দাম বাড়বে, জিনিস যা পাওয়া যাচ্ছে তার বেশী পাওয়া যাবে না।

একে তো উৎপাদন কম, তার উপব গ্রামের চেয়ে শহরের ক্রয়শক্তি বেশী, সুতবাং বেশীর ভাগ জিনিস শহরের ভাগে পডছে। শহরের সংখ্যা ও শহবেব লোকসংখ্যা বহুগুণ হয়েছে। সুতরাং শহর যা কিনে রাখছে তাব পরে গ্রামেব কেনবাব যোগ্য জিনিস সামান্যই অবশিষ্ট থাকছে। সেই সামান্য জিনিস পডছে গ্রামেব ভাগে। চাষী দেখছে সে যা দিচ্ছে তাব তুলনায় সে যা পাচ্ছে তা অত্যন্ত কম। যদি দ্রব্যবিনিময় প্রথা প্রচলিত থাকত তা হলে চাষী কিছুতেই এত কম জিনিসের বদলে এত বেশী ধানচাল ছাডত না। মুদ্রাবিনিময় প্রথার কাবসাজিতে ভুলে সে কাঁচের দামে কাঞ্চন ছাডছে।”

সুশীতল বলল, “এবার আমাকে বাধা দিতে হবে।”

বিনু বলল, “আগে সবটা শোন। প্রথম কয়েক বছর ওবা খুব লাভ করেছিল। কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে ততই ওদেব লোকসান হচ্ছে। ওরা ঠকে যাচ্ছে। কিন্তু বুঝতে পাবছে না কেন ঠকছে, কে ঠকাচ্ছে। টকাচ্ছে শহব। হাতীর মতো তাব খোবাক। উপবন্তু হাতীর মতো তাব হাওদা চাই, সজ্জা চাই। গ্রামগুলো যেন পিঁপড়ে আর শহরগুলো যেন হাতী। পিপড়ের মুখেব গ্রাস যাচ্ছে হাতীব পেটে, অথচ হাতী তাব বদলে ছাডছে না পিঁপড়ের সাজপোষাক। পিঁপড়ে আশা করেছিল দেশ স্বাধীন হলে তার বরাত ফিরে যাবে, কিন্তু শাদা হাতীব রং কালো হয়েছে বলে তাব খোরাক তো কমেনি, পোষাক তো কমেনি, বরং কিছু বেড়েছে। কালো হাতী যদি হোলি খেলতে খেলতে লাল হাতী হয় তা হলেও তার খোরাক কমবে না, পোষাক কমবে না,

বরং আরো বাড়বে। পিপীলিকার অতীত অন্ধকার, বর্তমান অন্ধকার, ভবিষ্যৎ অন্ধকার। সে যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরে আছে, সেই তিমিরেই থাকবে। যদি না—”

সুশীতল বাধা দিয়ে বলল, “যদি না পিঁপড়েরা হাতী হয়ে ওঠে।”

বিনু নীচু গলায় বলল, “অথবা হাতীরা পিঁপড়ে।”

নেপালদা গরম হয়ে বললেন, “হাতী কখনো পিঁপড়ে হয় না। হতে পারে না।”

অধ্যাপক সায় দিয়ে বললেন, “ইতিহাসে নজির নেই।”

বিনু বলল, “নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করতে হবে।”

সুশীতল তর্ক করল, “সভ্য মানুষের ইতিহাস, না অসভ্য অর্দ্ধসভ্য মানুষের?”

বিনু বলল, “আমিও সে কথা ভাবছি কিছু দিন থেকে। সেইজন্যে জোর গলায় এসব কথা বলছিনে। দেখছি দেশ এখনো মধ্যযুগের মায়া কাটাতে পারছে না। গান্ধীবাদী বন্ধুরা পল্লীগ্রামে চরকার পুনঃপ্রবর্ত্তন করতে গিয়ে লক্ষ করছেন জাতিভেদ পুনঃপ্রবর্ত্তন করা হচ্ছে। বিকেন্দ্রীকরণের ফলে যদি জাতিভেদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় তা হলে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করা হবে না। হবে পুরাতন ইতিহাসের রোমন্থন। মনুসংহিতার সমাজ ফিরে আসবে, যে যার জাতব্যবসা নিয়ে থাকবে, অসবর্ণ বিবাহ চলবে না, এই যদি হয় বিকেন্দ্রীকরণের পরিণাম তা হলে আমাদের ইতিহাস শেষ হয়ে গেছে, আমাদের নতুন কিছু দেবার নেই, আমরা প্রাচীনকালের ফসিল। আমি যে নতুন

সমাজের স্বপ্ন দেখতে চাই সে সমাজে জাতিভেদ থাকবে না, মানুষকে জন্ম অনুসারে ভাগ করা হবে না। কে বামুনের ছেলে, কে বাগদির ছেলে কেউ জানবেও না, কেউ জানাবেও না। তা যদি না হয় তবে কাজ নেই বিকেন্দ্রীকরণে। শহরগুলো আছে বলে তবু আধুনিক যুগের হাওয়া গায়ে লাগছে। আমি আমার দেশকে যেমন ভালোবাসি তেমনি ভালোবাসি আমার যুগকে। দেশ আমার জননী, যুগ আমার জনক।"

সুশীতল খুশি হয়ে বলল, "তা হলে তুমি আমাদের দিকে।"

বিনু বলল, "যুগ সম্বন্ধে যখন ভাবি তখন আমি তোমাদের দিকে; কিন্তু দেশ সম্বন্ধে যখন ভাবি তখন গান্ধীবাদীদের দিকে। আমি আধুনিক যুগ থেকে আরো আধুনিক যুগে যেতে চাই, সেই সঙ্গে শহর থেকে যেতে চাই গ্রামে।"

নেপালদা বললেন, "কী করে সেটা সম্ভব?"

অধ্যাপক বললেন, "পিছু হটতে হটতে কেউ সামনের দিকে এগোতে পারে?"

বিনু বলল, "সেইজন্যেই তো নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করছি। ভাবছি এখন বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলব না। বললে হয়তো দেশের লোক মনু পরাশরের যুগে ফিরে যেতে চাইবে। মনু পরাশর তাঁদের যুগের জন্যে যেসব আইন করেছিলেন এরা শুনছি নিজেদের যুগের জন্যে সে সব আইন বলবৎ রাখবে। যারা সব সময় পিছন পানে মুখ ফিরিয়ে রয়েছে তাদের কাছে যদি বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলি তা হলে

তারা বুঝবে না যে এটা নতুন সমাজের সুরে বাঁধা। আগে তারা আধুনিক হোক, তার পরে তাদের শোনাব আধুনিকতর সমাজের কথা।"

নেপালদা বললেন, "কিন্তু কথায় কথায় আমরা মূল প্রসঙ্গ থেকে সরে এসেছি। কেন আমরা খেতে পাচ্ছিনে, এই আমার প্রশ্ন। এর কী উত্তর ?"

বিনু বলল, "এর উত্তর চাষীরা টের পেয়েছে যে বিনিময়ের বাজারে তারা ঠকে যাচ্ছে। তাই আর মন দিয়ে চাষ করছে না। উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে। ভালো সার, ভালো বীজ বিনা পয়সায় পাওয়া যায় না। লাভের আশা না থাকলে কেন তারা পয়সা খরচ করবে ? বিনা মূল্যে সরবরাহ করলে ফসল বাড়তে পারে। জলসেচ সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। কেউ কি দাম দিয়ে দামোদরের জল নেবে ? নেবে, যদি বিনামূল্যে পায়। মোট কথা চাষীকে সব রকমে সাহায্য করতে হবে। তা হলে ফসল বাড়বে।"

নেপালদা বললেন, "কিন্তু সরকারের এত টাকা কোথায় ?"

বিনু বলল, "অন্যান্য খাতে খরচ কমাতে হবে। তা যদি সম্ভব না হয় তবে জমিদারি হাতে নিতে হবে। যে টাকাটা জমিদারের ঘরে যাচ্ছে সেটা সরকারের ঘরে যাবে। সেখান থেকে চাষীর ঘরে।"

অধ্যাপক বললেন, "কিন্তু খেসারৎ ?"

বিনু বলল, "খোসারৎ নয় পেনসন। তাতে যদি ওরা নারাজ হয় তা হলে দেশের লোককে খাওয়ানোর ভার ওদের হাতেই তুলে দাও। ওরাই গবর্ণমেণ্ট গঠন করুক। কিছুদিন চালিয়ে দেখুক চলে

কি না। ওদের দায়িত্বহীনতার দাওয়াই হচ্ছে ওদের হাতে শাসনের দায়িত্ব অর্পণ করা।"

অধ্যাপক বললেন, "কিন্তু ওটা কি গণতন্ত্র সম্মত হবে?"

বিনু বলল, "নাই বা হলো। শ্যাম রাখব, না কুল রাখব?"

সুশীতল খুশি হয়ে বলল, "এই যে তুমি দেখছি আমাদের দিকে।"

বিনু বলল, "তোমরা কি এ বিষয়ে একমত?"

নেপালদা বললেন, "আরে না, না। তা কি হয়!"

অধ্যাপক বললেন, "ওটা গঠনতন্ত্র বিরোধী। গণতন্ত্র বিরোধী।"

বিনু হেসে বলল, "আমি জানতুম। সোজা রাস্তা নেই, সুশীতল। খাদ্যসঙ্কট দিন দিন আরো তীব্র হবে। আমেরিকার কাছে চাঁদা করে, রাশিয়ার কাছে চাঁদা করে যত দিন চলে চলবে। তার পর হয় অন্তঃপরিবর্ত্তন, নয় বড় রকম একটা বিপর্যয়।"

সুশীতল উল্লাসে অধীর হয়ে বলল, "তার মানে বিপ্লব। তুমি আমাদের দিকে।"

বিনু হেসে বলল, "বিপ্লব মানে তো লাল হাতীর তাণ্ডব। পিঁপড়েরা হাতীর পায়ের তলায় গুঁড়িয়ে যাবে যে।"

নেপালদা গম্ভীরভাবে বললেন, "এসব হাসি তামাশার বিষয় নয়। জীবনমরণের প্রশ্ন। কাচ্চা বাচ্চাদের নিয়ে যে কী কষ্টে আছি সে আমি জানি আর জানে আমার স্ত্রী। কোথায় আমাকে একটু আশ্বাস দেবে না লাল হাতীর তাণ্ডবের ভয় দেখাচ্ছ।"

অধ্যাপক বললেন, "না, না, ভয় দেখাবে কেন? আমার মনে হয়

বিনু একটা কিছু হাতে রেখেছে, হাতে রেখে বলছে। সেইজন্তে অত হাসি। বিনু, বলো দেখি এর কোন সমাধান আছে কি না।”

বিনু বলল, “যাঁহা মুশকিল তাঁহা আসান। যদি আমার কথা মেনে নাও যে বিনিময়ে মুশকিল তা হলে বিনিময়েই আসান। বিনিময়টা যাতে চাষীর অনুকূল হয় সে দিকে নজর দিতে হবে। চাষীকে আরো টাকা না দিতে পারো আরো পণ্য জোগাও। তা হলে সে তোমাকে আরো অন্ন জোগাবে।”

অধ্যাপক বললেন, “টাকা যা দিচ্ছি তার বেশী দেওয়া যায় না।”

বিনু বলল, “তার মানে পণ্য যা দিচ্ছি তার বেশী দেওয়া যায় না। বেশ, তা হলে অন্ন যা পাচ্ছি তার বেশী পাওয়া যায় না।”

নেপালদা বললেন, “আমি কিন্তু বুঝতে পারলুম না।”

বিনু তাঁকে বুঝিয়ে বলল, “যে টাকা আপনি চাষীকে দিচ্ছেন সে টাকা দিয়ে সে কাপড় কিনছে মনে করুন। সে বলছে আরো টাকা দিন, তা হলে আরো কাপড় কিনব। আপনি বলছেন, না, আর টাকা পাবে না, আর কাপড় কিনবে না। তখন সে বলছে, আর কাপড় কিনব না তো আর ধান বেচব না। আপনি তা হলে যা খেতে পাচ্ছেন তার বেশী খেতে পাবেন না। এই যা পাচ্ছেন এও পাচ্ছেন প্রোকিওরমেণ্টের কল্যাণে। প্রোকিওরমেণ্ট না থাকলে এটুকুও পেতেন না। এই টাকায় এর বেশী পাওয়া তো দূরের কথা।”

নেপালদা বললেন, “তুমি তা হলে কী করতে বলো?”

বিনু বলল, “প্রোকিওরমেণ্ট যদি রাখতে হয় তবে শুধু ধানচালের

বেলা কেন? কাপড়চোপড় বাসনকোসনের বেলা কেন নয়? প্রোকিওরমেণ্ট আছে বলে আপনার টাকার ক্রয়শক্তি যত হওয়া উচিত তার চেয়ে বেশী হয়েছে। তা হলে প্রোকিওরমেণ্টকে আরো ব্যাপক করে চাষীর টাকার ক্রয়শক্তি আরো বেশী করুন। চাষীর আবশ্যক দ্রব্য প্রোকিওর করতে বলুন। বিনিময়ে সে যদি কিছু বেশী পায় তা হলে চাষবাস মন দিয়ে করবে। আরো ফসল ফলাবে। নিজে খাবে, আপনাকে খাওয়াবে।"

অধ্যাপক বললেন, "সর্ব্বনাশ। কলকারখানায় প্রোকিওরমেণ্ট! কলওয়ালারা পাড়া মাথায় করবে না? আকাশ ফাটাবে না?"

নেপালদা বললেন, "তা কি হয়!"

বিনু হেসে বলল, "হাতীর খোরাকের বেলা প্রোকিওরমেণ্ট। পিঁপড়ের পোযাকের বেলা তা কি হয়!"

সুশীতল বলল, "এই হাতী পিঁপড়ের মামলা দেখছি সহজে মিটছে না।"

বিনু বলল, "না। সহজে মিটবে না। ব্যাপার অনেক দূর গড়াবে। কপালে দুঃখ আছে। কিন্তু যাঁহা মুশকিল তাঁহা আসান। বিপদের মধ্যেই উদ্ধারের সঙ্কেত রয়েছে।"

অধ্যাপক বললেন, "এখন আমি বুঝতে পেরেছি তুমি যা বলতে চাও! চাষী যা উৎপাদন করছে ও চাষীর জন্যে যা উৎপাদন করা হচ্ছে উভয়ের মধ্যে একটা সমতা থাকা চাই। আজকের দিনে সেই সমতা ন হয়েছে। কিন্তু কেন নষ্ট হলো? কবে থেকে নষ্ট হলো?"

প্রত্যয়

বিনু বলল, "মুদ্রাস্ফীতির দরুণ নষ্ট হলো। যুদ্ধের সময় থেকে নষ্ট হলো। যুদ্ধের গোড়ার দিকে চাষীর লাভ হচ্ছিল বলে সে টের পায়নি। শেষের দিকে সে ভাবতে আরম্ভ করে। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে সে দাবী করে কণ্ট্রোল তুলে দাও। তার সে দাবী এখনো ছাড়েনি। দেশে যদি বড় বড় শহর না থাকত, শহরের লোককে খাওয়ানোর দায়িত্ব না থাকত তা হলে চাষীর মুখ চেয়ে কণ্ট্রোল উঠিয়ে দেওয়া যেত। কিন্তু তার তো উপায় নেই।"

অধ্যাপক বললেন, "কণ্ট্রোল উঠে গেলে সর্বনাশ।"

নেপালদা আঁতকে উঠলেন। "আবার মন্বন্তর হবে।"

সুশীতল ঘাড় নড়ল। "না, অত বড় ঝুঁকি আমরাও নেব না।"

বিনু বলল, "সমতা ফিরে না এলে যে দশা হবে সেটা তিলে তিলে সর্বনাশ, তিলে তিলে মন্বন্তর। সেটা যদি তোমাদের সহ্য হয় তা হলে আমার কিছু বলবার নেই।"

অধ্যাপক বললেন, "আমি কিন্তু ভাবছি মুদ্রাস্ফীতির কথা। নষ্টের গোড়া যদি হয় ইনফ্লেশন তা হলে গোড়া ঘেঁষে কোপ মারতে হবে। কণ্ট্রোল উঠিয়ে দিয়ে কী হবে, ইনফ্লেশন বন্ধ করো। তা হলে দেখবে সমতা ফিরে এসেছে।"

বিনু বলল, "তার মানে কী জানো? তার মানে যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ করতে হবে। সৈন্য দল ভেঙে দিতে হবে। এত পুলিশ থাকবে না। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক হবে অহিংসার। বিরোধ যদি বাধে তবে তার মীমাংসা হবে অহিংস পদ্ধতিতে। এক পক্ষ তৈরি থাকবে মার

খেয়ে মার ফিরিয়ে না দিতে। অথচ কাপুরুষের মতো নয়, ক্লীবের মতো নয়। দেশ যদি এর জন্যে তৈরি থাকত তা হলে মুদ্রাস্ফীতি এত দিনে বন্ধ হয়ে যেত। কিন্তু তৃতীয় মহাযুদ্ধের আশঙ্কায় সব দেশই তটস্থ। আমাদের দেশও।"

নেপালদা বললেন, "যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত না হয়ে উপায় নেই। উপায় যা ছিল তা গান্ধীজীর সঙ্গে সঙ্গে লোপ পেয়েছে। অহিংসার মর্যাদা বুঝত ইংরেজ, বুঝবে না পাকিস্তানী মুসলমান, বুঝবে না কোনো দেশের কমিউনিস্ট। যেমন কুকুর তেমনি মুগুর চাই। সৈন্যদলের খাতে ব্যয়সংক্ষেপ চলবে না। চলবে না পুলিশের খাতে।"

বিনু বলল, "তা হলে এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে! এই মুদ্রাস্ফীতির জলতরঙ্গ!"

নেপালদা বললেন, "হরে মুরারে। হরে মুরারে। কবে তিনি আসবেন? দেরি হচ্ছে কেন? কল্কী অবতারের।"

সুশীতল উৎফুল্ল হয়ে বলল, "তিনি আসবেন। তিনি আসবেন। আমাদের দল থেকে।"

নেপালদা সন্ত্রস্ত ভাবে বললেন, "না, না। আমি ওকথা ভেবে বলিনি। আমি ধর্মপ্রাণ হিন্দু।"

সুশীতল বলল, "ধর্মের যুগ গেছে। যে অধর্ম নিজের চোখে দেখছি তার পরে আর ধর্মের কাহিনী কানে শুনতে চাইনে।"

অধ্যাপক বললেন, "যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ না করলে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা যাবে না। মুদ্রাস্ফীতি রোধ না করলে কণ্ট্রোল তুলে দেওয়া চলবে না।

কণ্ট্রোল তুলে না দিলে চাষী যা উৎপাদন করে তার সঙ্গে চাষীর জন্যে যা উৎপন্ন হয় তার সমতা রক্ষা হবে না। সমতা রক্ষা না হলে চাষী মন দিয়ে চাষবাস করবে না। চাষী মন দিয়ে চাষবাস না করলে খাদ্য সঙ্কট দিন দিন আরো তীব্র হবে। মানুষ এক দিনে মরবে না, তিলে তিলে মরবে। কেমন, ঠিক বলেছি তো?"

বিনু সায় দিল। "ঠিক বলেছ।"

অধ্যাপক বললেন, "কিন্তু যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ করা না করা ভারতের হাতে নয়। মার্কিনের হাতে, রুশের হাতে। তারা বন্ধ করবে বলে মনে হয় না।'

সুশীতল বলল, "রাশিয়া তো আপ্রাণ চেষ্টা করছে শান্তির জন্যে। যত দোষ আমেরিকার।"

অধ্যাপক বললেন, "শান্তির জন্যে নয়, সময়ের জন্যে। কিন্তু শোন আমার কথা। যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ করা আমাদের হাতে নয়। তার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে আর সকলের মতো আমাদেরও। তা যদি হয় তা হলে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা আমাদের অসাধ্য। তা হলে কণ্ট্রোল তুলে দেওয়ার দায়িত্ব নেবে কে? আমরা নিতে পারিনে। তা হলে সমতা রক্ষার জন্যে কী করতে পারি? হাঁ, এইটেই প্রশ্ন।"

বিনু বলল, "চাষীর উৎপন্ন শস্য প্রোকিওর করার আগে চাষীর প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রোকিওর করতে পারো।"

নেপালদা বললেন, "অসম্ভব।"

বিনু বলল, "চাষীকে সব রকমে সাহায্য করার জন্যে জমিদারিগুলো

হাতে নিতে পারো। যার জমি নেই তাকে বিনা সেলামীতে জমি দিতে পারো।"

নেপালদা বললেন, "অভাবনীয়।"

বিনু বলল, "শহরগুলোর লোকসংখ্যা অর্দ্ধেক কমাতে পারো। দরকারী কাজ করছে না এমন লোক দেখলেই শহরের বাইরে চালান দিতে পারো।"

নেপালদা বললেন, "অকল্পনীয়।"

বিনু বলল, "বেকার বা অলস লোক দেখলেই চরকা কাটতে, ঘানি ঘোরাতে, দড়ি পাকাতে, জাল বুনতে বাধ্য করতে পারো। তা হলে চাষীর প্রয়োজনীয় দ্রব্য বহু পরিমাণে উৎপন্ন হবে, সে তার উৎপন্ন শস্যের উপযুক্ত বিনিময় পাবে।"

নেপালদা বললেন, "অকার্যকর।"

বিনু বলল, "প্রত্যেকের বাড়ীতে আলাদা রান্না করলে কিছু না কিছু অপচয় হয়। পাড়ার দশখানা বাড়ীর লোক পালা করে পরস্পরের জন্যে রাঁধলে অপচয় হয় না, খাদ্য বাঁচে। তার ফলে প্রোকিওরমেন্টের চাপ কমে। চাষী একটু নিঃশ্বাস ফেলতে পারে। চাষের উপর তার ঘেন্না ধরে যায় না।"

নেপালদা বললেন, "আষাঢ়ে গল্প।"

বিনু বলল, "শহরের লোক যে যার বাড়ীর ছাতের উপর মাটির টবে অল্পসল্প শাকশব্জি ফলাতে পারে। যার উঠোন আছে সে

উঠোনে। ভাতের সাধ শাকসব্জিতে মেটে না, তবু কতকটা সুরাহা হয়। চাষীর উপর থেকে চাপ কমে।"

নেপালদা বললেন, "গাঁজাখুরি।"

বিনু তখন হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, "নেপালদা, যে মরবে বলে পণ করেছে কেউ তাকে বাঁচাতে পারে না। খাদ্য আমদানি করে ক'দিন চলবে? আমদানি যেদিন বন্ধ হবে সেদিন সবান্ধবে পটল উত্তোলন।"

নেপালদার মুখ শুকিয়ে গেল। তিনি বলে উঠলেন, "নারায়ণ! নারায়ণ!"

অধ্যাপক বললেন, "সমতা রক্ষার কথাই ভাবছিলুম। যেমন করে হোক সমতা রক্ষা করতে হবে। চাষীকে ধাপ্পা দিয়ে, তার উপর জোর জোর জুলুম করে সোভিয়েট রাশিয়ায় ওরা একটা সমাধান করেছে, তা বলে আমরাও যদি তাকে ধাপ্পা দিই, তার উপর জোর জুলুম করি, তা হলে তার মন ভেঙে যাবে, সে যন্ত্রের মত কাজ করতে করতে যন্ত্র বনে যাবে। আর আমরাও আমাদের ব্যক্তিস্বাধীনতা হারিয়ে বসব। কণ্ট্রোলের খোরাক খেতে খেতে যে খেতে দিচ্ছে তার কণ্ট্রোলে বাস করব। না, ভায়া, এ অবস্থা বেশী দিন চলতে দেওয়া ঠিক নয়। দেশের লোক পেটের দায়ে যে কোনো একজন ডিকটেটরের পায়ে ব্যক্তিস্বাধীনতা বিকিয়ে দেবে। সে যদি হয় বিদেশী ডিকটেটর তা হলে কেবল ব্যক্তি-স্বাধীনতা নয়, জাতীয় স্বাধীনতা বিপন্ন।"

সুশীতল বলল, "এ আজাদী ঝুটা হৈ। থাকলেই বা কী, গেলেই বা কী।"

প্রত্যয়

নেপালদা বললেন, "নির্বাচনের আর কত দেরি? আমিও এবার দাঁড়াব। হয় আমাকে খাদ্য দাও, নয় আমাকে ভোট দাও। হয় ভোট, নয় মৃত্যু।"

অধ্যাপক চিন্তান্বিত হলেন। তাঁকে বলতে শোনা গেল, "সমতা রক্ষা করতে হবে। ব্যালান্স ফিরিয়ে আনতে হবে। নতুবা—নতুবা গণতন্ত্র থাকবে না, গঠনতন্ত্র টিকবে না। স্বাধীনতা বিপন্ন।"

(১৯৫১)